আনন্দমেলা

১১ মার্চ ১৯৮৩

১.৫০

আশ মিটিয়ে আকাশ-ছোঁয়া
মহল বানাবো···
সবদিকেতেই রঙবেরঙের
জেম্‌স লাগাবো !

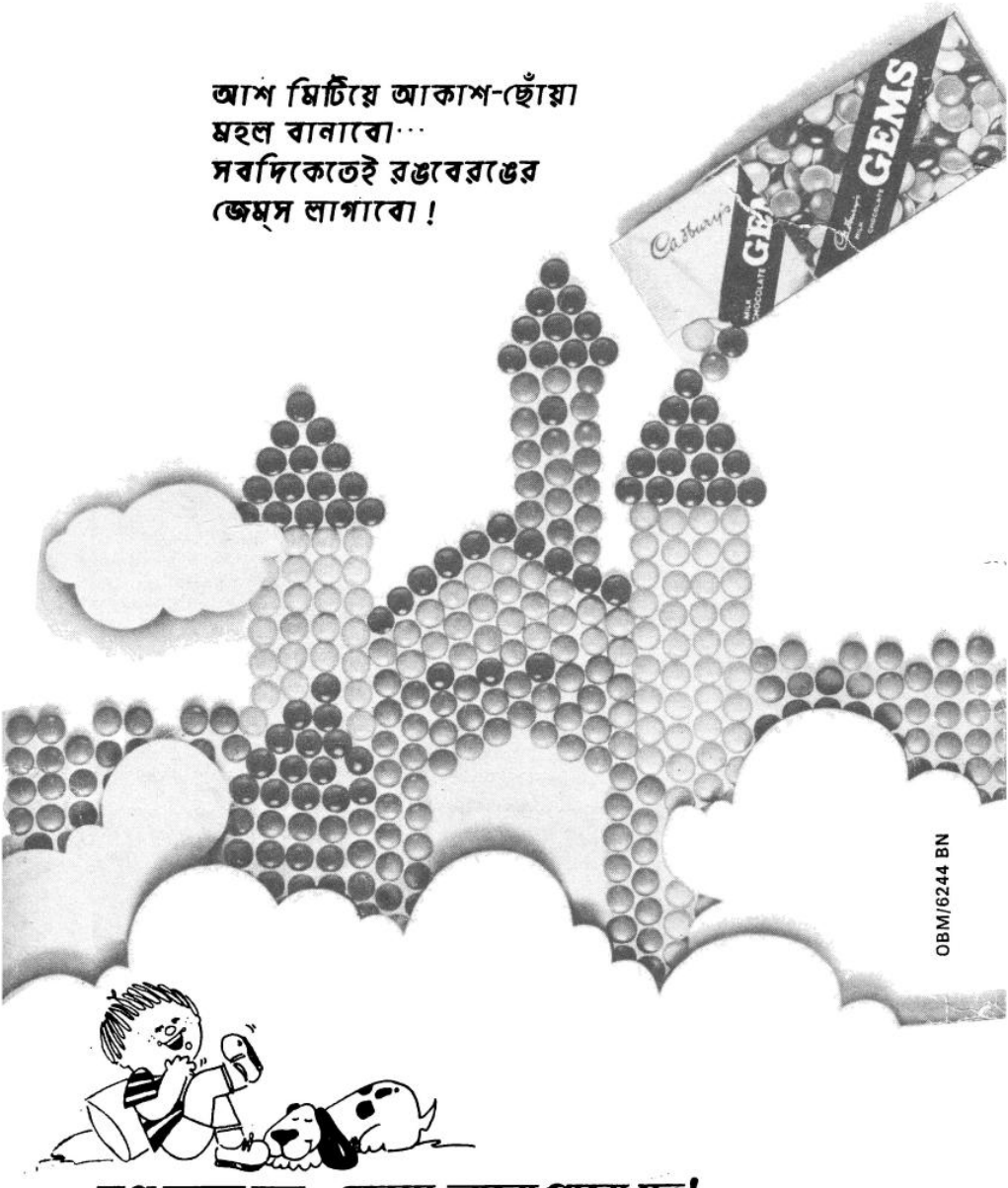

OBM/6244 BN

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

আনন্দমেলা

২৭ ফাল্গুন ১৩৮৭ • ১১ মার্চ ১৯৮১ • ৬ বর্ষ • ২৪ সংখ্যা

ছড়া
এক মাকড়সা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩
ভেলুর কীর্তি। তপনকুমার প্রামাণিক ৫৭

গল্প
দাদুর ইঁদুর। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১০
মাঝেরহাট ব্রিজে...। জীবন ভৌমিক ১৫
মাঠের রাজা। মানবেন্দ্র পাল ৫৫
গল্পে ধাঁধা। হিমাদ্রি লাহিড়ী ৬৬

উপন্যাস
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১
সিসের আঙটি। বিমল কর ৪৯

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২৫

ভ্রমণকাহিনী
টাওয়ারের ভূত। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৪
ভিনদেশী এক ছোট্ট গাঁয়ে। মহাশ্বেতা চৌধুরী ৩৬

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি.কে. ৫৩

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া
ভাষার খেলা। কুম্ভক ৫৮
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৫৯
হরিনাভি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৬২
টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট বয় ৬৩

খেলাধুলো
এডিলেডে ড্র। অলোক দাশগুপ্ত ৪২
পরাস্ত প্রকাশ। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৫
জাতীয় বক্সিং। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯
সন্দীপ পাতিলের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১
প্রচ্ছদ অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেটা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

মন-মাতানো গল্প

কালো ঘোড়া

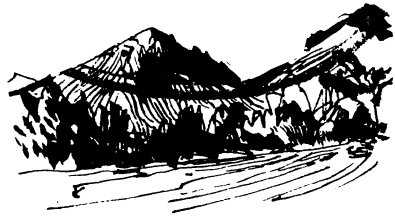

পবিত্র সরকারের

ভ্রমণ-কাহিনী

ইয়োসিমিটি

এবং

আরও অজস্র আকর্ষণ

টাওয়ারের ভূত

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

একটা প্রাচীন দুর্গ দেখে ভেতরে-ভেতরে নেচে ওঠেন না এমন লোক আছেন কি? দুর্গের দেওয়ালে হাত রাখলে, তার সিঁড়ি বেয়ে উঠলে, তার খুদে-খুদে জানলা দিয়ে বাইরে নীল আকাশ কিংবা সবুজ প্রান্তরের দিকে উঁকি মারলে মনটা দুঃখে ভরে যায়। কোনো-কোনো দরজায় কান রাখলে হয়তো আমরা আগের দিনের রাজা-বাদশাহ কি আমির-ওমরাহের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাই। হয়তো সেই ধ্বনি আমাদের মনের ব্যাপার, কিন্তু তাহলেও শুনি তো! আমার ছেলেবেলায় ধারণা ছিল একটা দুর্গ না থাকলে একটা রাজাকে রাজাই বলা উচিত না তার যত গন্ডা প্রাসাদই থাকুক।

দুর্গের সঙ্গে আরেকটা কথাও মনে আসে। জানতে ইচ্ছে করে ওই দুর্গে কি কোনো অশরীরী আত্মা আছে? সাদামাটা কথায় যাকে বলি ভূত। রাজা-রাজড়ারা তো কত লোককেই বন্দী করে রাখতেন তাঁদের দুর্গে। মেরেও ফেলতেন কত কত লোককে। বিশেষ করে রাজা যদি হতেন নিষ্ঠুর। মৃত্যুর পর সেই সব লোকের অতৃপ্ত আত্মা নিশ্চয়ই বাসা বাঁধে সেই-সেই দুর্গে। আর ভূতের আখড়াই যদি বলতে হয় তবে টাওয়ার অব লন্ডনের মতো একটা ভূতুড়ে জায়গা দুনিয়ার পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ন'শো বছরের পুরনো এই দুর্গে এত-এত মানুষকে নির্দয়ভাবে যাবজ্জীবন বন্দী রাখা হয়েছে কিংবা হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে জ্যান্ত মানুষের চেয়ে প্রেতাত্মার সংখ্যা অনেক, অনেক বেশি। এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও নিত্যদিন এখানে এমন উপদ্রব আজও ঘটে চলেছে যে, দুর্গের প্রহরীরা বিনা তর্কে ভূতের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। ভূতে বিশ্বাস না করলে লন্ডন টাওয়ারে চাকরি রাখা দায়। ভূতের সম্পর্কে কথা বলতে পেলে দুর্গের প্রহরীরা আর কিছুই চান না। ভূতদের ওঁরা জ্যান্ত মানুষ বা সেই দিনের কাগজের বড় খবরের মতন আলোচনা করেন। আমার কাছে লন্ডন

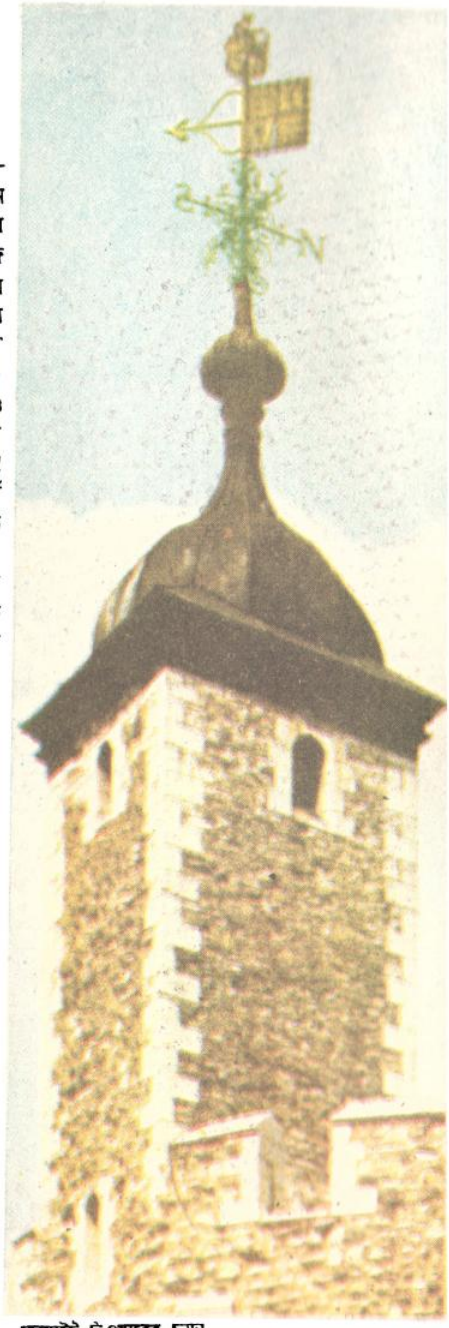

হোয়াইট টাওয়ারের চূড়া

স্যার ওয়ালটার রলে

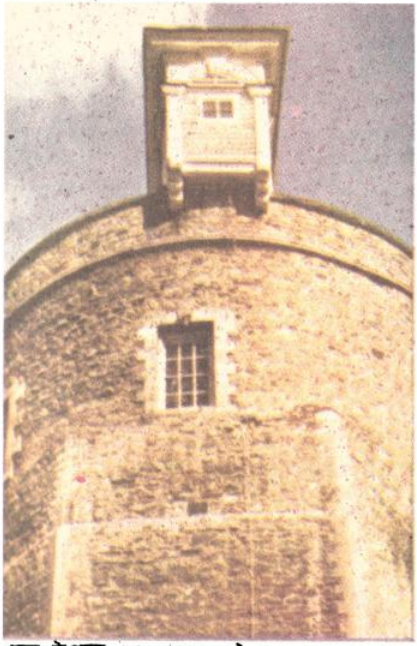

বেল টাওয়ার (কে ওখানে ঘন্টা বাজায়)

টাওয়ার দেখতে টাওয়ার বড় আকর্ষণ ছিল এই ভূত।

টিকিট কেটে টাওয়ারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যিনি অভ্যর্থনা করেন ইংরেজিতে তাঁর নাম বিফীটার। এঁরা প্রাণ ভরে বিফ বা গোরুর মাংস খান বলেই যে এঁদের এই নাম তা কিন্তু নয়। বিরাট লাল এবং সোনালি পোশাক পরা এই লোক-গুলোর মাথায় থাকে কালো একটা বড় চ্যাপটা ধরনের হ্যাট বা টুপি। দেখতে অনেকটা কালো কেকের মতন। এছাড়া তাঁদের হাতে থাকে একটা মস্ত দন্ড। আমাদের ভাগ্যে যে বিফীটার পড়েছিলেন তিনি ভারী রসিক। তিনি কেবলই একটা না একটা রসিকতা করছিলেন এবং টাওয়ারের ইতি-হাস বলতে বলতে তার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছিলেন একটা করে ভূতের গল্প। এর

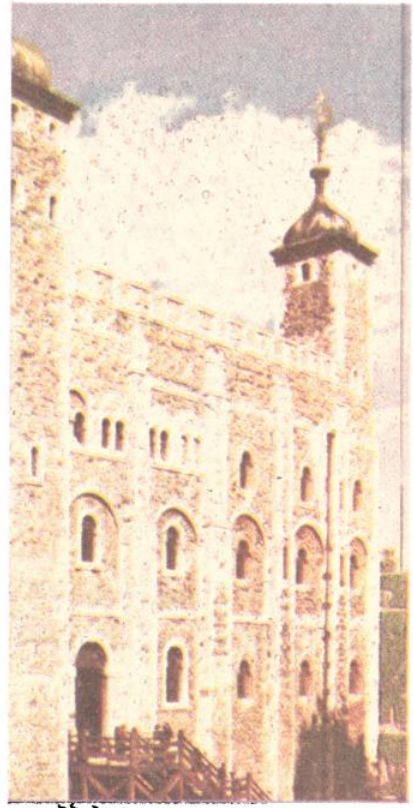

হোয়াইট টাওয়ার

অনেকগুলোই নাকি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। এছাড়া অন্যের গল্প তো আছেই। রৌদ্রোজ্জ্বল ওই বসন্তের সকালেও আমাদের শরীরে একটা শিরশিরে ভাব দেখা দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে আছি হয়তো ব্লাডি টাওয়ারের তলায়, (ব্লাডি টাওয়ারের নামটার মধ্যেই যেন রক্তের গন্ধ) হঠাৎ বিফীটার বললেন, "এবার আপনারা তাকান আপনাদের পিছনের ব্রিজটার দিকে। তলায় দেখতে পাচ্ছেন একটা সরু খাল। ওই ব্রিজে এসে প্রায়ই হানা দিত সেন্ট টমাস বেকেটের আত্মা। তাই বার বার বিনা কারণে ভেঙে পড়েছিল ব্রিজটা। সেন্ট টমাস তাঁর ধর্মের দন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন —এই দৃশ্য দেখেছেন অগুন্তি লোক।" আমরা ওই ব্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তলায় স্থির সবুজ জল। টেমসের খাঁড়ি বেয়ে এসেছে। বহু রাজবন্দী এই পথেই নৌকো করে এসেছেন, এই দুর্গে। এবং আর কখনও ফিরে যাননি। গোটা ব্রিজ এবং নালাটায় যেন ভয়ের গন্ধ। ব্রিজের ও আত্মার সম্মানে তার উপরে একটা দুর্গ বানিয়ে তার নামকরণ হয়েছিল সেন্ট টমাসেজ টাওয়ার।

টাওয়ার অব লন্ডন কিন্তু একটাই দুর্গ নয়। বলা চলে অনেকগুলো দুর্গের সমষ্টি। তবে মুখ্য যে দুর্গ, যার ছবির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি, তার নাম হোয়াইট টাওয়ার। কারণ অন্যান্য ধূসর বর্ণের দুর্গের তুলনায় এ দুর্গ অনেকটা সাদাটে। এবং এটা বানাতে শুরু করেন উইলিয়ম দি কঙ্কারার। সেই বিখ্যাত রাজা যিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এসে ইংল্যান্ড অধিকার করেন। তাঁর নতুন গড়ে ওঠা রাজত্বকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং রাজধানী লন্ডনকে সুরক্ষিত করার জন্য তিনি ১০৭৮ খ্রীস্টাব্দে এই দুর্গ তৈরি শুরু করেন। তারপর শয়ে শয়ে বছর ধরে এই দুর্গের আশপাশে গড়ে উঠেছে আরও নানান দুর্গ। সে-সব দুর্গকে ঘিরে আবার তৈরি হয়েছে বিশাল পরিখা এবং দেওয়াল। সবটা মিলিয়ে যাকে আমরা এখন টাওয়ার অব লন্ডন বলি।

রাজধানীর সুরক্ষার জন্য নির্মিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই টাওয়ার অব লন্ডন পরিণত হল নিরীহ জনগণের নিগ্রহের জেল-খানায়। অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে একজন বিদেশী পর্যটক লিখলেন, "টাওয়ারে কেউ বন্দী থাকলে মানুষের আর সাহস থাকে না তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলার। পাছে তাকেও সেই দোষের দোষী ঠাউরে টাওয়ারে পাঠানো হয়।" রানী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ-ভাগে বেশ কয়েকটা দুর্গের কিংবা তোরণের নামকরণ হয়ে গেল ব্লাডি টাওয়ার বা ট্রেটর্স গেট (বিশ্বাসঘাতকের তোরণ)।

টাওয়ার অব লন্ডনে বন্দী থেকেছেন এবং পরে হাড়িকাঠে মাথা দিয়েছেন ভুবনবিখ্যাত পর্যটক এবং বীর স্যার ওয়ালটার রলে। বহু বছর বন্দী থাকার পর ১৬১৮ সনের ২৪ অকটোবরের ভোরে প্রহরী এসে ডেকে তুলল স্যার ওয়ালটারকে। বলল, 'স্যার, আপনার মৃত্যু আজ।" বীরদর্পে এগিয়ে চললেন রলে। ভৃত্য পিটার বলল, "স্যার, আপনি চুল আঁচড়াবেন না?" রলে বললেন, "যাদের মাথা বেঁচে থাকবে তারাই আঁচড়াক।" তারপর ওয়েস্টমিন্সটারের ওল্ড প্যালেস চত্বরে তিনি তাঁর নির্ভীক মস্তকটি পেতে দিলেন খাঁড়ার নীচে। আজও ব্লাডি টাওয়ারের অন্ধকারে তাঁর বীর, পেরেকের মতন লম্বা শরীরটা কেউ না কেউ দেখে ফেলে। বন্দী-জীবনে যে পাথর-বাঁধানো চকটায় তিনি প্রতিদিন হাঁটতেন সেটির নাম হয়েছে রলেজ ওয়াক। ১৯৭৬ সনে এক ভদ্রমহিলা স্যার ওয়ালটারকে হাঁটতে দেখেন ওই চত্বরে। এবং চেনার সঙ্গে-সঙ্গেই মূর্ছা যান।

ব্লাডি টাওয়ারে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখা যায় তৃতীয় হেনরির সেই নিষ্পাপ দুটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে। রাজা হওয়ার বাসনায় কুচক্রী তৃতীয় হেনরি যাদের টাওয়ারে বন্দী করে রেখে-ছিলেন। পরে যে দুই শিশুর কথা বাইরের জগৎ আর কখনও জানতে পারেনি, শোনা যায় তাদের নাকি বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে টাওয়ারের চত্বরে কবর দেওয়া হয়েছিল। শেকসপীয়রের হেনরি দি থার্ড নাটকে এই হত্যার আভাস পাবে।

রানী প্রথম এলিজাবেথ রানী হওয়ার আগে যে দুর্গে বন্দী ছিলেন তার নাম বেঁশ টাওয়ার। বেল টাওয়ার এবং বেঁশ টাওয়ারের মাঝখানে একটা মস্ত প্রাচীর আছে। এর ওপরে এলিজাবেথ রোজ সকালে হাঁটতেন। সে রাস্তার নাম হয়েছে এলি-

জাবেথস ওয়াক। এলিজাবেথ অবশ্য দুর্গে মারা যাননি। কিন্তু ওই দুর্গেই মারা গেছেন শত শত নিরীহ রাজকীয় পুরুষ। রাত দুপুরে এলিজাবেথস ওয়াকে হাঁটতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে হোঁচট খান লোকে। অথচ রাস্তার কোথাও কোন উঁচু-নিচু পাথর নেই। অনেক সময় একটা দমকা হাওয়া এসেও ছুঁড়ে ফেলে দেয় কাউকে। কারণ অজানা।

বেল টাওয়ারে বন্দী ছিলেন ডিউক অব মনমোথ। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাজার বিরুদ্ধে মনমোথ একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

প্রচন্ড লড়াইয়ের পর বিদ্রোহ দমন হলে তরুণ মনমোথকে এনে নিক্ষেপ করা হয় বেল টাওয়ারে। বিচারের পর তাঁকে ভয়ঙ্কর সেই টাওয়ার হিলে নিয়ে যাওয়া হয় হত্যার জন্য। এই টাওয়ার হিলে দুর্গের বন্দীদের হয় ফাঁসি দেওয়া হত, না-হয় হাড়িকাঠে ফেলে কোতল করা হত। বিরাট জনসমাগম হয়েছিল মনমোথের —মৃত্যু দেখার জন্য, —কারণ তাঁকে স্নেহ করতেন লন্ডনবাসীরা অনেকেই। এছাড়া মধ্যযুগে যখন প্রায়ই ফাঁসি কিংবা বলি হত টাওয়ার হিলে তখন গোটা শহরে প্রায় ছুটির ধুম পড়ত। দলে দলে শহরবাসী এসে ওই করুণ নাটক দেখত আর ভাবত, যাক, আমি তো বেঁচে আছি।

হাড়িকাঠে মাথা নোয়ানোর আগে মনমোথ তাঁর জল্লাদকে কতকগুলো সোনার মোহর দিলেন এবং বললেন, "তোমরা লর্ড রাসেলকে তিন-চারবার আঘাত করে মেরেছ। আমারটা যদি জলদি না সারো তাহলে আমার ধড় যে হাড়িকাঠ থেকে উঠে দাঁড়াবে না সেরকম প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, ডিউক অব মনমোথের দেহ থেকে মুন্ড আলাদা করতে পাক্কা পাঁচ কোপ লেগে গেল। উপস্থিত জনতা তখন রেগে আগুন। শোনা যায় দ্বিতীয় কোপের পর মনমোথ ঘাড় ঘুরিয়ে জল্লাদের দিকে তাকান এবং বলেন, "কৈ, এখনও পারলে না?"

কিন্তু নাটকের শেষ এখানেই নয়। মনমোথের মৃত্যুর পর রাজার হুঁশ হল যে, ডিউকের কোনো প্রতিকৃতি নেই রাজপ্রাসাদে। তখন বিচ্ছিন্ন ধড় এবং মাথা ফের এক করে সাজিয়ে শিল্পী দিয়ে আঁকানো হল ওঁর ছবি। এবং গলার কাটা দাগ ঢাকতে এক কাঁড়ি কাপড়চোপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল কাটার জায়গাটা। বেশ টাওয়ারে তাই আজ মনমোথের অতৃপ্ত আত্মার হানা। জিনিসপত্র নিয়মিত ওলটপালট হচ্ছে, চাপা কান্নার স্বর, অর্ধমৃত মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং যখন-তখন সুপুরুষ মনমোথের শরীরের ছায়া এখানে সেখানে। কখনো-কখনো বেল টাওয়ারের ঘন্টার আওয়াজ। যা কেউ-কেউ শুনতে পায়, কেউ কেউ পায় না।

অ্যান বোলিন

টাওয়ার গ্রীনে বন্দী ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরির দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যান বোলিন। যিনি ছিলেন রানী এলিজাবেথের মা। রাজার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। রানী এলিজাবেথও যৌবনে বন্দী ছিলেন দুর্গে। কিন্তু তিনিও পরে বহু লোকের মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন তাঁর পিতার মতন। তাঁরই পিতার নির্দেশে টাওয়ারে বন্দী হন বিখ্যাত মনীষী স্যার টমাস মোর। স্যার টমাস কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি চার্চের ওপর রাজার কর্তৃত্ব। পরে এক বিচারের প্রহসন করে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়। সেদিন তাঁর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেছিল সমস্ত ইংল্যান্ডবাসী।

লন্ডন টাওয়ারের চত্বরে একটা দুর্গই আছে যেখানে বন্দীদের নানান ভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হত, তাদের জবানবন্দী আদায়ের চেষ্টা করা হত। সে-সব যন্ত্র দেখলে গা শিউরে

টাওয়ারে প্রাণ দিয়েছিলেন (উপরে বাঁ দিক থেকে) স্যার টমাস মোর, টমাস ক্রমওয়েল, (নীচে বাঁ দিক থেকে) ষষ্ঠ হেনরি, হেনরি হাওয়ার্ড

ওঠে। প্রশ্ন জাগে, একটা সভ্য সংস্কৃতির মানুষ এসব করেছে কী করে? সভ্যতা যেন দুর্গের দেওয়াল অবধি এসে থেমে গেছে। সেই সব যন্ত্রের কোনোটা দিয়ে বন্দীর বুকের পাঁজরা ভেঙে দেওয়া হত। কোনোটা দিয়ে তার পায়ের গিঁটগুলো আলগা করে দেওয়া হত। কোনোটাতে আবার তাকে দুরমুশ করার পর তালা-চাবি দিয়ে ফাঁসিয়ে রাখা হত। ওইভাবে কিছুকাল থাকার পর একটা লোকের শরীরটা একটা চাকার মতন হয়ে যেত। অধিকাংশই যন্ত্রের মধ্যে প্রাণত্যাগ করত।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আরেক ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে। একটা বলির কুঠার এবং মাথা রাখার কাঠের ব্লক। ব্লকটায় এখনও রক্ত লেগে আছে। তাতে একটা ফাটলের দাগ। ওই ব্লকে ওই কুঠারের দ্বারা প্রাণ নেওয়া হয়েছিল লর্ড লোভাটের। ১৭৪৭ সনে। লন্ডনের দুর্গের শেষ বলি তিনি। তার পরে অবশ্য দুর্গে বন্দী অনেকেই থেকেছেন।

লন্ডনের টাওয়ারের ভেতর ঘুরলে যেমন ইতিহাসের সান্নিধ্য মেলে তেমনি ঘনিষ্ঠ ইঙ্গিত পাওয়া যায় অসংখ্য মৃত্যুর। রাত বাড়লে তাই ভয় জাগে প্রেতাত্মার। বাজি রেখে লন্ডন টাওয়ারে ভূত দেখতে যাওয়ার মতন মূর্খামি তাই আর কিছুই নেই। সন্ধের পর এমনিতেই টাওয়ারের চেহারাটা ক্রমশ ভৌতিক হতে শুরু করে। কঠিন মনেও ভয় জাগে। তাই সন্ধের দিকে টাওয়ারের পাহারাদাররা ঘোরাফেরা করেন দল বেঁধে। ওই টাওয়ারেই আছে ইংলন্ডেশ্বরীর যাবতীয় ধনসম্পত্তি। রাত-বিরেতে ভূতেরাও বুঝি সেই সবের পাহারা দেয়। আমাদের গাইড ছিলেন যে বিফীটার তিনি তো বলেই ফেললেন, এ দুর্গে যা ভূতের উৎপাত তাতে এখানে পাহারা না বসালেই চলে। কার সাধ্যি ভূতকে ফাঁকি দিয়ে রানীর সম্পত্তি নিয়ে পালাবে?

দিনে এবং রাতে লন্ডন টাওয়ারের দুই রূপ। অনেকের মতে দুর্গের এই রাতের রূপটাই নাকি তার আসল রূপ।

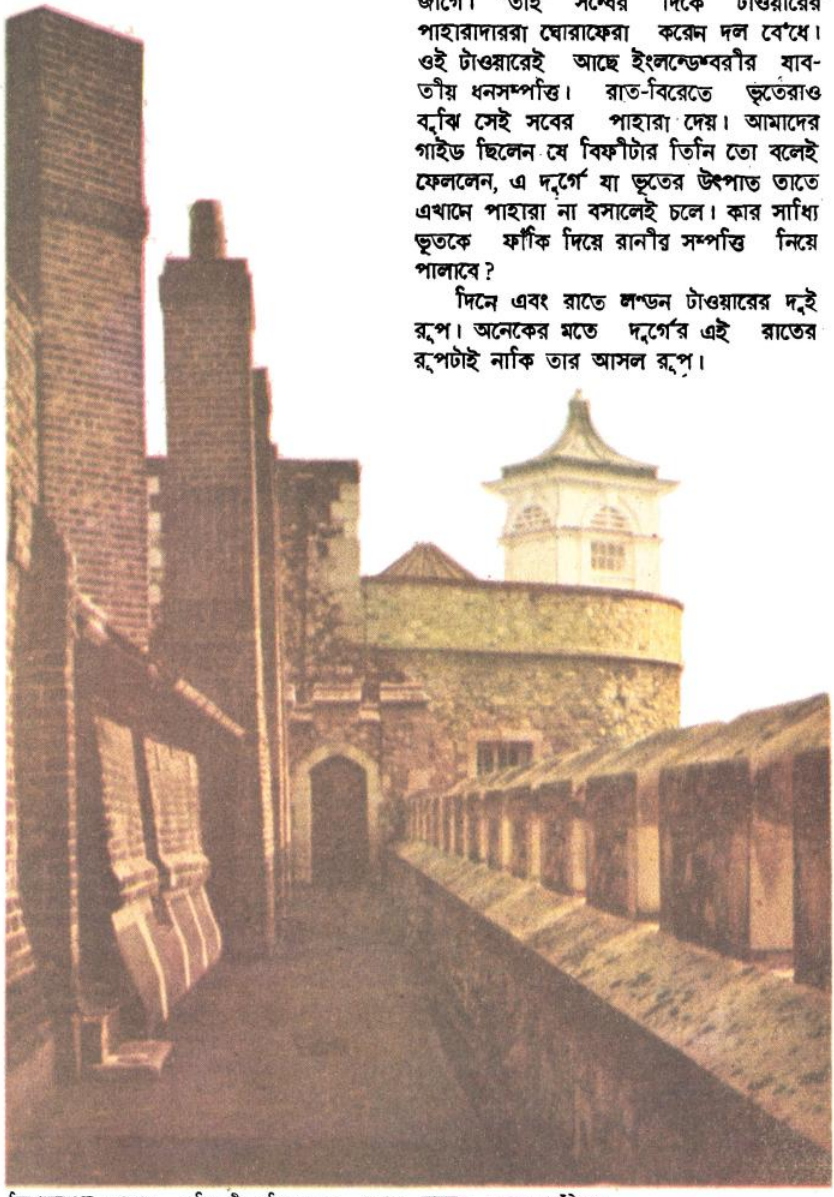

এলিজাবেথ্স ওয়াক। বন্দিনী এলিজাবেথ রোজ সকালে এখানে হাঁটতেন

দাদুর ইঁদুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"আজ শেক্‌সপিয়ারস!" বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা মোটা বই টেনে নিয়ে দাদু লাফাতে লাগলেন, "কাল সারারাত ধরে ব্যাটারা শেকসপিয়ার চিবিয়েছে।" বই যেখানে ছিল, সেইখানেই কুচো-কুচো কাগজ পড়ে আছে। দু-একটা টুকরো বইয়ের গায়ে লেগে ঝুলছে। "আর ক্ষমা করা যায় না। নো মারসি। এটা ধেড়েদের কাজ, নেংটিদের দাঁতে শেকসপিয়ার সইবে না।"

বইটায় বুকে হাত বুলোতে বুলোতে দাদু চিৎকার করলেন, "দেওকিনন্দন, এ দেওকি-নন্দন!"

নীচের বাগানে যেন মেঘ ডেকে উঠল, "জি হাঁ।"

"তুরন্ত আ যাও।"

দাদু ডেকচেয়ারে বসলেন। চোখমুখ খুবই ভীতিপ্রদ। "বুঝলে, পরশু মেটিরিয়া-মেডিকা, তার আগের দিন রবীন্দ্ররচনাবলী. আজ শেক্‌সপিয়ার। খিদে আর হুজমশক্তি, দুটোই ক্রমশ বাড়ছে। মেটিরিয়ামেডিকায় ওষুধ আছে। নাকসভমিকার পাতা খেয়ে ব্যাটারা আগে খিদে বাড়িয়েছে।"

"ওষুধের নাম লেখা পাতা খেলেও ওষুধের কাজ হয় দাদু!"

"হবে না? সেই ঘটনার কথা তোমার মনে নেই? উত্তাল নদী পেরোতে হবে। নৌকো নেই। সাঁতার জানা নেই। শিষ্যের হাতে গুরু একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললেন, এইটা মুঠোয় ধরে হেঁটে পার হয়ে যাও। শিষ্য হেঁটে নদী পার হচ্ছে। সত্যিই সে ডুবছে না। মাঝনদী বরাবর এসে তার মনে হল, আচ্ছা দেখি তো কী আছে এতে। খুলে দেখলে লেখা আছে রাম-নাম। যেই মনে হওয়া রামনামের এত জোর, বাস, ভড় ভড় করে ডুবে গেল।"

"মনে আছে, বাবা বহুবার আমাকে এই গল্প বলেছেন। তবে রামনামের জোর হিসেবে নয়, শিষ্যের বিশ্বাসের গল্প। গল্পটা শেষ করেন এই বলে—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।"

"সেই বিশ্বাসে আমার কথাটাও তুমি মেনে নাও, তর্ক কোরো না। মেটিরিয়ামেডিকা বুকে চেপে ধরলে খাবি-খাওয়া রোগী বিছানায় উঠে বসে।"

"তা হলে এত মানুষ মারা যায় কেন?"

"বিশ্বাস নেই বলে।"

"তার মানে সেই বিশ্বাস।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আই হ্যাভ নো টাইম। আমার মন খারাপ। আমার শেকস্‌পিয়ার খেয়ে গেছে।"

"জি হাঁ।" হাঁ-হাঁ করে দেওকিনন্দন ঘরে ঢুকল। নীচের বাগানে একা-একা বোধ হয় কুস্তি করছিল।

মাথার পেছনে মাটি লেগে আছে। ভোজ-পুরি গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে আছে। দেওকি-নন্দন সামনে থাকলে দাদুও গলাটাকে খুব গম্ভীর-মতো করার চেষ্টা করেন। দেওকির আদুরে নাম রেখেছেন দাদু দেবু।

"দেবু, একটা ইঁদুরকল চাই।"

"জি হাঁ। লে আয়েগা। লেকিন জাঁতি-কল কি খাঁচাকল?"

"জাঁতি নেহি, জাঁতি নেহি। উ বীভৎস হ্যায়। খাঁচা মাঙতা।"

"ঠিক হ্যায় জি, হো যায়েগা। লেকিন লেংটিকে লিয়ে কি ধেড়ে কে লিয়ে?"

"ইধার আও।"

দেওকি সামনে ঝুঁকে পড়ল। দাদু বইটার কুরে-কুরে খাওয়া অংশ দেওকির সামনে তুলে ধরলেন।

"এ কিসকা কাম?"

দেওকি ভাল করে দেখে বললে, "ধাড়িয়াকা।"

"তব ধেড়ে কি লিয়ে খাঁচাকল লে আও।"

দেওকি সামনের দোকান থেকে এক টাকার লাড্ডু কিনে আনল। প্রথমেই একটা লাড্ডু আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, "টেস্ট করো।"

মুখে দিয়ে বললুম, "ভেরি টেস্টফুল।"

দেবুকে একটা দিলেন। "ক্যায়সা?"

"বহুত বড়িয়া।"

দাদু একটা খেলেন। "হাঁ, মালুম হোতা হ্যায়, বড়িয়া।"

ঠোঙায় পড়ে আছে আর-একটা। দেওকি সেটাকে কলে পুরল। এখন কলটাকে কোথায় রাখা হবে? ইঁদুরের চোখে পড়া চাই। ইঁদুরের আবার চোখ কী! সর্বত্র তার চোখ। দেওকির পরামর্শে কলটাকে একটা বইয়ের র‍্যাকের তলায় রাখা হল।

৩

কল এসে গেছে। দাদুও এসে গেছেন কোর্ট থেকে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ। দাদুর লাইব্রেরি ঘরে কলের কেরামতি চলেছে। দাদু নির্দেশ দিচ্ছেন। দেওকি করে যাচ্ছে।

"ময়দাকা এতনা ছোটা-ছোটা গোলি বানাও। ময়দা কি খায়েগা? সন্দেহ হ্যায়। লোভনীয় কুছ চিজ চাহিয়ে।"

আমি মেঝেতে থেবড়ে বসেছিলুম। বললুম, "কেক।"

"ওটা তোমার প্রিয়, ইঁদুরের প্রিয় হবে কি? কেয়া দেবু, প্রিয় হোগা?"

"লাড্ডু হোগা জি।"

"হাঁ হাঁ, লাড্ডু। লে আও।"

ভীষণ ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। অন্যান্য দিন দাদুই আমাকে টেনে তোলেন। আজ আবার দাদুর কী হল। ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে সেই ফর্সা টকটকে মুখ দেখতে না-পেলে কেমন যেন লাগে।

দাদুকে খুঁজে পেলুম লাইব্রেরি-ঘরে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে আছেন। সামনে ইঁদুরকল। গোঁফঅলা এইটুকু ইঁদুর কলের জাল-লাগানো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আশ্চর্য! কলের ভেতরের লাড্ডুটা সে চেখেও দেখেনি। দাদুর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে। দুঃখ-দুঃখ ভাব।

হাঁটুর ওপর হাত রেখে শরীরটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে ইঁদুরটাকে দেখছিলুম। এইবার

থেবড়ে বসে পড়লুম।

"কী সুন্দর দেখতে দাদু।"

"বিউটিফুল।"

"গা-টা দেখেছ? তেল-চুকচুকে। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বলে পুঁতির মতো। মুখটা কত বুদ্ধিমান।"

"অসাধারণ। এত কাছ থেকে ইঁদুর আমি কোনও দিন দেখিনি। বড় আদরের জিনিস হে।"

"কী করবেন?"

"সারারাত বেচারা না-খেয়ে আছে? একটা বিস্কুট আন তো।"

বিস্কুট নিয়ে এলুম। দাদু গুঁড়ো-গুঁড়ো করে কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ইঁদুরটা কাঁপতে কাঁপতে কোণের দিকে চলে গেল। বিস্কুট ছুঁলেই না। দাদু বললেন, "প্রাণভয়ে ভীত। কেমন বুঝতে পারে দেখেছ? জানে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।"

নীচে দেওকির বাজখাঁই গলা শোনা গেল। দাদু কলটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। "দেওকির হাত থেকে একে বাঁচাতে হবে খোকা। দেখলেই মারতে চাইবে। চল, বাগানের এক কোণে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

দেওকির চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দুজনে বাগানের পাঁচিলের ধারে এসে কলটা খুলতেই ইঁদুরটা বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে তেড়ে এল এক ডজন কাক।

"তাড়াও, তাড়াও, গেল গেল!" দুজনে হই - হই করে কাক তাড়াতে লাগলুম। কাকের পেটে যেতে-যেতেও ইঁদুরটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। জল যাবার নর্দমা ধরে সোজা দৌড়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

"বাঁচ গিয়া। বাঁচ গিয়া। ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া।"

দাদুর থেই-থেই নৃত্য। আমি দম বন্ধ করে ছিলুম এতক্ষণ। আমিও নাচতে লাগলুম। দেওকি বললে, "হুয়া কেয়া?"

দাদু বিজয়ীর মতো বললেন, "বাঁচ গিয়া, বাঁচ গিয়া।"

"কৌন বাঁচ গিয়া জি?"

"চুহা। চুহা।"

দাদুর সে কী নাচ!

ছবি দেবাশিস দেব

আবার চালু কর

দোলের আগের দিন পাড়ার ময়লা পরিষ্কার করে পুড়িয়ে দেবার যে রীতি আছে সে বিষয়ে গত তিন চার বছর ধরেই তো বলে আসছি। কৈ তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নাতো তোমাদের কাছ থেকে?

এবারে আরও একবার জানাচ্ছি। আশা করি তোমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে একাজে এবং আমাদের জানাবে। চাঁচোড় বা ন্যাড়াপোড়া কিছু নতুন জিনিস নয় আমাদের দেশে। কিন্তু এই উৎসবের উদ্দেশ্যটা আজ তোমাদের চোখে পাল্টে গেছে। তোমরা কাঠ, গাছের গুঁড়ি, ভাঙ্গা ফার্নিচার, ঘুঁটে, কাগজ, রাবারের টায়ার ইত্যাদি জেলে আজকাল ন্যাড়াপোড়ার আগুন জ্বালছো। কিন্তু নিয়মটা তো সেরকম ছিল না। শীতের ঝরা পাতা, এলাকার যাবতীয় আবর্জনা দল বেঁধে জড়ো করে বসন্ত পূর্ণিমার আগের রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। এগুলো সবই বৈজ্ঞানিক কারণ সম্মত সামাজিক রীতিনীতি।

পুরোনো দিনের যেসব ভাল ভাল নিয়মকানুন আমাদের স্বাস্থ্যের কারণে গড়ে উঠেছিল, আজকের ছোটরা সেগুলো আবার চালু করার ভার নাও না কেন?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ হইতে প্রচারিত)

এক মাকড়সা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

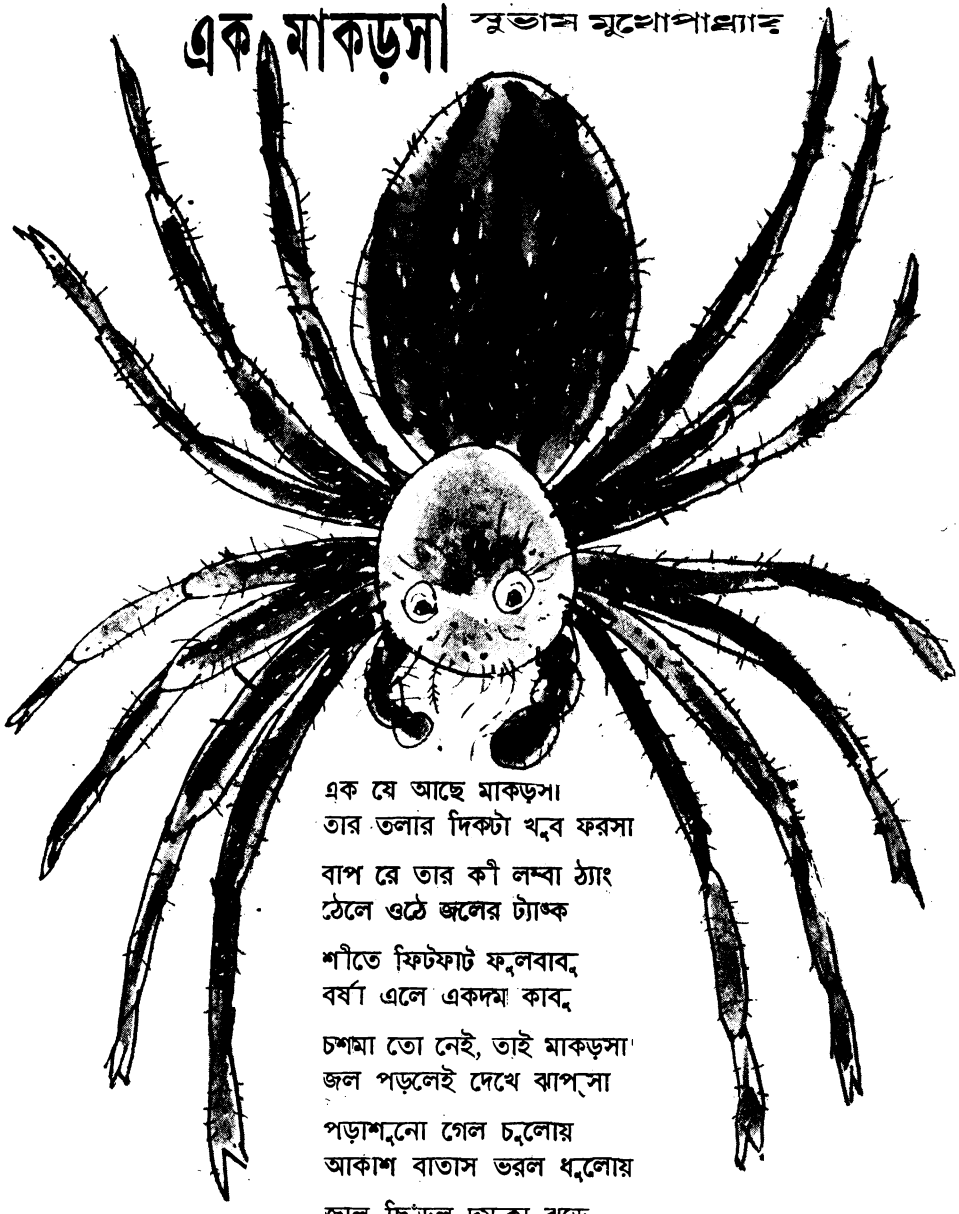

এক যে আছে মাকড়সা
তার তলার দিকটা খুব ফরসা

বাপ রে তার কী লম্বা ঠ্যাং
ঠেলে ওঠে জলের ট্যাঙ্ক

শীতে ফিটফাট ফুলবাবু
বর্ষা এলে একদম কাবু

চশমা তো নেই, তাই মাকড়সা
জল পড়লেই দেখে ঝাপ্‌সা

পড়াশুনো গেল চুলোয়
আকাশ বাতাস ভরল ধুলোয়

জাল ছিঁড়ল দম্‌কা ঝড়ে
তখন মাকড়সা কী আর করে

বেছে নিল যেই ছাদের আল্‌সে
বুঝলাম ওর চোখে চাল্‌সে ॥

ছবি দেবাশিস দেব

ভালো পাউডার মাগ্‌গী পড়ে
আর সস্তার পাউডার খুব বাজে হয়

কিন্তু
স্বস্তিক কাপড় ধোয়ার পাউডার
সবচেয়ে সেরা

২ কিলো,
১ কিলো,
৫০০ গ্রাম আর
২০০ গ্রামের
নতুন পলিপ্যাকে
পাবেন

কারণ এ হ'ল সাশ্রয়ের সঙ্গে উৎকৃষ্ট জিনিসের এক অপূর্ব মিলন।
অর্থাৎ যথেষ্ট সস্তা অথচ খুব ভালো।

নীল
স্বস্তিক
ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার

Shilpi-DM 24 PG Ben

মাঝেরহাট ব্রিজে রাত বারোটা

জীবন ভৌমিক

ঘটনাটি ঘটেছিল দেড় বছর আগে। এতদিন কাউকে বলিনি। কারণ মনে-মনে ভয় ছিল। এখন ভয় কেটে গেছে। কেউ বিশ্বাস করুক আর না-করুক, আসল ঘটনাটি সকলকে জানানো দরকার। তাছাড়া আমার ভয়টাই বা কী! আমি তো আর খুন করিনি। ঐ জোড়া হত্যার মধ্যে তখনও পুলিস আমার নামগন্ধ পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। এবং একথাও আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ঐ জোড়া হত্যার রহস্য-সমাধান পুলিস আর কোনও দিন করতে পারবে না।

এবার তা হলে বলি। সংক্ষেপেই বলব। কিন্তু খবরের কাগজের সেই কাটিংটা গেল কোথায়! ঐ খবরটা দিয়েই তো শুরু করব ভেবেছিলাম। এই তো পেয়েছি।—

স্টাফ রিপোর্টার। ৫ ডিসেম্বর। গতকাল ভোরবেলায় ডায়মন্ড হারবার রোডের মাঝেরহাট ব্রিজের নীচে রেললাইনের উপরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুজনেরই বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। পুলিসের সন্দেহ যে, ব্রিজের ওপর থেকে ওদের নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মাঝেরহাট স্টেশনের ঐ রেললাইন দিয়ে গতরাত্রে ১১টা ৪৮ মিনিটে গাড়ি গেছে। তখন ওখানে মৃতদেহ দুটি ছিল না! পরদিন সকালের ফার্স্ট ট্রেন যাওয়ার আগেই ঐ মৃতদেহ একজনের নজরে পড়ে। রাত বারোটার পর এই হত্যাকান্ড ঘটেছে বলে পুলিসের অনুমান। তাদের মতে ঐ ব্রিজ যতখানি উঁচু, তাতে সেখান থেকে কাউকে ফেলে দিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবার কথা নয়। মৃতদেহ দুটি ময়না-

শতাধিক বছর ধরে বিচক্ষণ
মায়েরা নির্ভর করে আসছেন।

উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার

CAS/OPPL/3/80/BEN

তদন্তের জন্যে পাঠানো হয়েছে। কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। জোর তল্লাশি চলছে। জানা গেছে ঐ দুই ব্যক্তি দক্ষিণ শহরতলির একটি বস্তির বাসিন্দা ছিল। এবং একজনের নাম ছিনতাইকারী হিসেবে পুলিসের খাতায় ইতিমধ্যেই রয়েছে।

খবরের কাগজ থেকে খবরের এই অংশটুকু কেটে আমি সেদিন খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ঘটনাটি আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে।

আমি খড়গপুরে রেল কোম্পানিতে চাকরি করি। সেখানে আমার কোয়ার্টার্স। অফিসের কাজে মাঝে-মধ্যে আমাকে কলকাতায় দু-তিনদিনের জন্যে আসতে হয়। কলকাতায় এলে আমি বেহালায় দিদির বাড়ি থাকি।

সেদিন শিয়ালদায় রেল অফিসের কাজ সেরে আমি দেখলাম রাত দশটা বেজেছে। ডিসেম্বরের শীত। আধ ঘন্টা বেহালার বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম যে, বাসের অপেক্ষায় আর না থেকে শিয়ালদা থেকে লাস্ট ট্রেনে মাঝেরহাট স্টেশন চলে যাওয়াই ভাল। তা না হলে শেষে হয়তো ফিরতেই পারব না। মাত্র দুটি তো স্টেশন!' এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব। মাঝেরহাট থেকে বাস বা ট্রাম না পেলেও আধঘন্টা হেঁটেই বেহালা পৌঁছে যাওয়া যাবে।

এর আগে শিয়ালদা থেকে মাঝেরহাট স্টেশন হয়ে বেহালায় আরও তিন-চারবার ফিরেছি। অবশ্য এত রাতে নয়। বেশি রাতে মাঝেরহাট ব্রিজ খুব নিরাপদ নয় বলে শুনেছিলাম। শীতকালের রাত এগারোটায় রাস্তাঘাট নির্যান না হলেও নির্জন হয়ে পড়ে। তবু সব দিক ভেবে ট্রেনেই ফিরছিলাম। ট্রেনের সব কামরা প্রায় ফাঁকা। আমাদের কামরায় পাঁচ-সাতজন যাত্রী।

সন্ধে থেকেই আকাশে কিছু কালো মেঘ ছিল। খুব ঠান্ডা হাওয়া। শীতটা বেশ পড়েছিল। তার ওপর বৃষ্টি শুরু হল। কালীঘাট স্টেশন আসার আগেই যখন বৃষ্টি এল ভাবলাম বাঁচা গেল। আর তো মাত্র একটা স্টেশন। পাঁচ-ছ মিনিটের ব্যাপার।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে খন্ডাবে কে! কালীঘাট স্টেশনের কাছাকাছি এসে আমাদের গাড়ি থেমে গেল। হয়তো সিগন্যাল পায়নি। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। কিন্তু মিনিট দশ পর একজন বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, সিগন্যাল তো রয়েছে! কী হল বলুন তো?, কী করে বলি বলুন, আপনিও যেখানে আমরাও সেখানে। এইসব কথাবার্তা। একজন বললে, চেন টেনেছে বোধহয়।

আমাদের কমপার্টমেন্টের চারজন নামবে কালীঘাটে। একজন মাঝেরহাটের পরের স্টেশনে। একমাত্র আমি মাঝেরহাটে। ইতিমধ্যে ঘড়িতে এগারোটা দশ। আমি মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠলাম। এই সময় বাইরে তাকিয়ে দেখি দু-তিনজন লোক গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গাড়ির পেছন দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল মশাই?" বললে, "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গাড়ি থেকে একজন পড়ে গেছে।"

যাদের কালীঘাটে নামবার ছিল তারা চারজন এই সময় লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। কারণ লাইন ধরে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই স্টেশন।

ট্রেন কতক্ষণ আটকে থাকবে কে জানে! আমার কামরায় তখন মাত্র দু'জন যাত্রী। আমি আর এক ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোক বললেন, "কী আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, ফাঁকা গাড়ি থেকে লোক পড়ে যায় কী করে?" আমি বললাম, "তাই তো ভাবছি।" আসলে আমি তখন ভাবছিলাম, রাত সাড়ে এগারোটা বাজে, দুর্যোগের রাত। মাঝেরহাটে নেমে যদি একজনও সঙ্গী না পাই তাহলে তো একটু গা-ছমছম করবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে ঠান্ডার মধ্যেও ঘামে আমার কপাল ভিজে উঠল।

পৌনে বারোটার সময় দেখলাম, যে তিনজন লোক গাড়ির লেজের দিকে গিয়েছিল তারা ফিরে আসছে। তাদের কাছে জানা গেল যে, চলন্ত গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে খুব ঠান্ডা হাওয়া আসছিল বলে ওদের কামরার একজন যাত্রী দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে গাড়ি থেকে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চেন টানা হয়েছে। লোকটা মারা গেছে। তার সঙ্গে কেউ ছিল না।

যাই হোক, দুর্ঘটনার বলি মৃতদেহটিকে

গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গার্ডসাহেব গাড়ি ছাড়লেন। মাঝেরহাট স্টেশনে যখন গাড়ি এল আমার ঘড়িতে তখন এগারোটা পঞ্চাশ।

বৃষ্টি তখন নেই। কনকনে ঠাণ্ডা, একটা এলোমেলো বাতাস চারদিকে দাপাদাপি করছে। প্লাটফর্মে নেমে আমি সামনে-পেছনে তাকিয়ে দেখি মাঝেরহাট স্টেশনে আমি ছাড়া অন্য কেউ নামেনি। এমনিতেই ছোট স্টেশন। সকালে বিকেলে কিছু ভিড় হয়। এত রাতে এই স্টেশনের যাত্রী কে থাকবে। কিন্তু না। একজন নেমেছে। আমার সামনের কামরা থেকেই বোধহয় নেমেছে। আমি খেয়াল করিনি। ভয়ের মধ্যে এবার একটু ভরসা পেলাম।

গায়ে মাথায় চাদর। পরনে ধুতি। লোকটা কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলেছে। আমি তার পেছন পেছন। "ও দাদা, শুনছেন!" দুবার ডাকলাম। শুনতে পায়নি। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে না ডাকতেই লোকটি ফিরে তাকাল নীচে আমার দিকে। হাওয়ায় তার চাদর উড়ছে। চাদরের ভেতর থেকে লোকটাকে দেখাই যাচ্ছে না। লোকটি আমার দিকে একবার ঘুরে কিছু না বলে বাকি কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

রাত বারোটার মাঝেরহাট ব্রিজ একেবারে জনশূন্য। এমনকী, যে দু-চারজন ভিখারি ব্রিজের ফুটপাথে রাত কাটায় তারাও আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। মাঝেমাঝে মালবোঝাই কয়েকটি লরি ট্রাক ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। হাওয়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

ব্রিজের উপর এসে আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোনদিকে যাবেন?" সে বললে, "নিউ আলিপুরের দিকে।" আমি বললাম, "তবে তো ভালই হল, আমি বেহালা যাব। চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক, ট্রাম বাস তো বন্ধ হয়ে গেছে।" লোকটি একটু ইতস্তত করে বললে, "চলুন।"

ব্রিজের রাস্তা ক্রস করে আমরা বাঁ দিকের ফুটপাথে উঠলাম। আর ঠিক সেই সময় অতর্কিতে কোথা থেকে যেন দুজন লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একজনের হাতে ছুরি। তারা বললে, "টাকা-পয়সা ঘড়ি আংটি যা আছে চটপট দিয়ে দিন।" আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমার হাতে দামি ঘড়ি আছে। পাথর বসানো সোনার একটি আংটি আছে, পকেটে গোটা চল্লিশ টাকা আছে। পকেট হাতড়ে কোনও মতে টাকাটা বের করছি, এমন সময় দুর্বৃত্তরা আমার সঙ্গী লোকটিকে বললে, "চাদরের নীচে কী লুকিয়ে রাখা হচ্ছে? বের করুন, নয়তো খতম করে দেব।" লোকটি তখন চাদরের ভেতর থেকে একটা বড় প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিল এবং এক অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় দুর্বৃত্ত দুজনের গলা টিপে ধরে ব্রিজের রেলিং-এর ওপর ঠেলে নিয়ে গেল। একজন দুর্বৃত্ত ছুরি চালাল। কিন্তু লোকটির গায়ে লাগল না। আমি ভয়ে দৌড়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু আমার হাত-পা এমন কাঁপছিল যে, আমি এগোতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি দুজন দুর্বৃত্তই মাটিতে পড়ে আছে। লোকটি একে একে দুজনকে তুলে রেলিং-এর ওপর দিয়ে ব্রিজের নীচে ফেলে দিল।

সমস্ত ঘটনা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কোনও মানুষের যে এত সাহস এবং শক্তি থাকতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

লোকটি আমার কাছে এসে বললে, "দিন আমার প্যাকেট। চলুন।"

যেন কিছুই হয়নি। এদিকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কোনও কথা বলতে পারছি না। শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব নাকি!

লোকটি যেন আমার মনের কথা শুনতে পেল। বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই।"

আমরা দুজনে মাঝেরহাট ব্রিজ ছেড়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে হাঁটছি। কিছুক্ষণ পরে লোকটি আপন মনে বলল, "এই প্যাকেটটি খড়গপুর পৌঁছে দেওয়া খুব দরকার।" উৎসুক হয়ে বলি, "খড়গপুরে আপনার কে আছে? আমি খড়গপুর থাকি।" চলতে চলতে সে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমিও খড়গপুর থাকি। ব্যবসা আছে। নিউ আলিপুরে আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলাম। আমার এক প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়ে। নিজের মেয়ের মতোই। এই বেনারসীখানা তার জন্যে

কিনেছি। কিন্তু আমার পক্ষে এখন খড়গপুর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। অথচ এই শাড়িখানা কালকেই পেঁছুনো চাই। পরশু মেয়েটির বিয়ে।" একদমে কথাগুলো বলে লোকটি থামল। আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তার কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল।

আমরা ইতিমধ্যে নিউ আলিপুরের রাস্তার কাছে এসে গেছি। হঠাৎ সে কর্কশ গলায় বলল, "প্যাকেটটা ধরুন। আমার নাম করে কালকেই ঠিকমতো পেঁছে দেবেন। ঠিকানা লিখে নিন। আমার নামটাও।"

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক হয়ে উঠছিল। আজকালকার দিনে, যতই অসুবিধে থাক, একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের হাতে কেউ তিন-চারশো টাকার জিনিস দিয়ে দেয়? কিন্তু তার কথা অমান্য করার বা তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস আমার ছিল না। আমি কোনওক্রমে বাড়ি পেঁছতে পারলে বাঁচি।

লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কলম বের করে কাপড়ের প্যাকেটের ওপরই আমি ঠিকানা লিখে নিলাম। এবং লোকটির নামটিও। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি মানুষটি নিউ আলিপুরের রাস্তায় না ঢুকে আবার মাঝের-হাট ব্রিজের দিকে ফিরে চলেছে। আশ্চর্য!

আমি এক মুহূর্ত ওখানে না দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এলাম। দিদি দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখে বললে, "কী হয়েছে তোর! এ কী চেহারা হয়েছে? এত রাত হল কেন?"

আমি শুধু বললাম, "বাইরে খুব দুর্যোগ তো!"

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম মাঝেরহাট ব্রিজে জোড়া খুনের সংবাদ বড় করে ছাপা হয়েছে। এবং অন্য পৃষ্ঠায় ছোট করে একটি পথ দুর্ঘটনার সংবাদ। কাগজ থেকে আমি দুটো সংবাদের অংশই সযত্নে কেটে রেখেছিলাম। পথ দুর্ঘটনা শীর্ষক সংবাদে কালীঘাট স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত খড়গপুর-নিবাসী যার নাম কাগজে ছাপা হয়েছিল সেই নামটি তারই নির্দেশে আমি লিখে নিয়েছিলাম! আমি আর ভাবতে পারছি না।

সকালের ট্রেনেই আমি খড়গপুর ফিরে গিয়েছিলাম। বেনারসীর প্যাকেটের ওপর ঠিকানা লেখা বাড়ি খুঁজে যখন সেখানে গেছি তখন বিয়েবাড়ির কোনও হৈ-চৈ ছিল না। চারদিকে একটা শোকের ছায়া। পাশের একটি বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ। বুঝতে পারলাম দুর্ঘটনার খবর পেঁছে গেছে।

লোকটির নাম করে বেনারসী শাড়ির প্যাকেটটি যথাস্থানে দিতেই সমস্ত বাড়িটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। আশপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন এল। আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি। কারণ আমি জানতাম যে, আমাকে নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করা হবে। এবং এও জানতাম যে, ঐ লোকটির ট্রেনে কাটা পড়ার এক ঘণ্টা পর মাঝেরহাট ব্রিজের রাত বারোটার কাহিনীর একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ভুল বুঝবে। আমি নতুন ঝামেলায় পড়ে যাব।

ছবি দেবাশিস দেব

শান্তিবাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখে এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, কী এত ভাবছ?" রাসেল বললেন, "দেখ, আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছি। যখন কোনো পণ্ডিত লোকের সঙ্গে কথা বলি, তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এই পৃথিবীতে সুখী হওয়া একেবারে অসম্ভব। আবার যখন আমার বাগানের মালির সঙ্গে কথা বলি, তখন কিন্তু ঠিক এর উল্টোটাই মনে হয়।"

"প্যারীর একলেয়ার পেয়েছি ভাই–
চকোলেটের এতো স্বাদ আর কোথাও নাই"।

মোড়ক খুলেই নতুন
আবিষ্কার—প্যারীর একলেয়ার্স !
প্রথমেই চাখো এ'র
পুরু আস্তরণ—যা মুখে লেগে
থাকে অনেকক্ষণ।
তারপর ভেতরটা—নরম,
কোকো ভরপুর
চকোলেটের স্বাদ।
আরো বেশী দুধ, আরো বেশী
চিনি···আরো বেশী মজা।

প্যারীর তৈরী
একলেয়ার
সবার সেরা একলেয়ার

Parry's

প্যারীজ
কন্‌ফেক্‌শনারী লিমিটেড
মাদ্রাজ

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গকাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" অচেনা লোক কাকাতুয়া কিনতে চায়। সাধু এসে পাখির উপর হামলা করে। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক আহত, তার জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছে। শীতের রাত্তিরে উদ্ধবের ঘরে ফ্যান চলে। সার্কাসে যে মুখোশ-পরা লোক রোমহর্ষক খেলা দেখায়, গোপনে তার পরিচয় জানতে গিয়ে ছয়ামূর্তি নিজেই আক্রান্ত। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, সে কে? তারপর—

॥ ৮ ॥

সামন্ত মশাইয়ের তাঁবুতে কুন্দকুসুম চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞানবয়সে এর আগে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই তিনি জ্ঞান হারাননি। অজ্ঞান হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম। কারো সঙ্গে গায়ের জোরে হেরে যাওয়াও এই প্রথম।

প্রবল শীতের মধ্যে একটা লোক তাঁর মুখে অনবরত জলের ঝাপটা দিচ্ছিল। কুন্দকুসুম জলদগম্ভীর স্বরে তাকে বললেন, "আর না।"

তারপর উঠে বসলেন। লোকটা বিনীত-ভাবে একটা গামছা এগিয়ে দিল। তিনি মুখ মুছতে-মুছতে দেখলেন, সামনেই একটা ফোল্ডিং চেয়ারে সামন্তমশাই উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই বলে, "এখন একটু ভাল বোধ করছেন তো?"

কুন্দকুসুম নিজের গলায় হাত বোলালেন। ব্যথা। কোমরেও যেন কুমির কামড়ে ধরে আছে। কব্জিটাও বেশ কাবু। ঝিনঝিন করছে। কিন্তু সেই বলবান লোকটার রাক্ষুসে আলিঙ্গনে তাঁর এতক্ষণে মরে লাশ হয়ে যাওয়ারই কথা। বেঁচে যে আছেন সেই ঢের। জলদগম্ভীর গলাতে বললেন, "বেশ ভাল বোধ করছি। এ-যাত্রায় মরছি না। মরলে আপনার পোষা হারকিউলিসটির ফাঁসি হত।"

সামন্তমশাই শশব্যস্তে বলে, "আগে একটু গরম দুধ খান। গায়ে বল হোক, তারপর সব কথা।"

তার ইশারায় মুহূর্তের মধ্যে একটা আধ-সেরি গ্লাস ভর্তি ঈষদুষ্ণ দুধ এসে গেল।

কুন্দকুসুম দুধটায় চুমুক দিয়ে বলেন, "বাঃ, বেশ দুধ। তা এ নিশ্চয়ই গরুমোষের দুধ নয়।"

"কেন বলুন তো!"

"আপনার হারকিউলিসটির গায়ে যা জোর, তাতে মনে হয় সে হাতির দুধ খায়। কিংবা বাঘের। আপনার সার্কাসে বাঘ আর হাতির তো অভাব নেই।"

সামন্ত বিনীতভাবে হাসে। তবে তার চাউনিতে উদ্বেগটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুন্দকুসুমের এই দুধটুকুর দরকার ছিল। চোঁ করে গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, "বিনা নোটিসে কাল রাতে আপনাদের তাঁবুতে হানা দেওয়া আমার উচিত হয়নি এটা মানছি। আমার সার্চ ওয়ারেন্টও ছিল না।"

সামন্তমশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, "আজ্ঞে একটা নোটিস দিয়ে এলে এই বিপদে পড়তেন না। অন্ধকারে আপনাকে চিনতে না পেরে চোর-ছ্যাঁচড় ভেবে আমাদের ওয়েটলিফটার ছেলেটা ওই কান্ড করে ফেলেছে।"

কুন্দকুসুম একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "ওর দোষ নেই। আমার আচরণটা চোরের মতোই হয়েছিল। আপনার পাহারাদাররা আমাকে ধরতে পারেনি, কিন্তু এই ছোকরা—কী নাম ছোকরার?"

"আজ্ঞে ভবতোষ। খুব ভাল ছেলে। ধার্মিক। মাঝরাতে উঠে নামধ্যান করে। কাল রাতেও তাই করছিল।"

"হ্যাঁ, ভবতোষ। তা এই ভবতোষ তো দিব্যি কারাটেও জানে। যা একখানা ঝেড়েছিল আমার কব্জিতে। ভাল কথা, পিস্তলটা আছে তো?"

সামন্ত মাথা নেড়ে বলে, "আছে। চিন্তা

করবেন না।"

কুন্দকুসুম বলেন, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমার এই আচরণের অর্থ কী! বলতে বাধা নেই, সেদিন সেই সাপের খেলা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। কোনো মানুষের অত অ্যাজিলিটি থাকতে পারে, তা জানতাম না। কিন্তু মনে হয়েছিল মাস্টার লখীন্দরের আসল নাম মাস্টার লখীন্দর নয়। মুখোশের আড়ালে লোকটি কে সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।"

সামন্তের চোখে উদ্বেগটা বাড়ল। বলল, "আজ্ঞে সে আর বেশি কথা কী? হুকুম করলেই তাকে সামনে হাজির করতাম। খামোখা এত কষ্ট করতে গেলেন।"

কুন্দকুসুমের আচরণটা যে অদ্ভুত ঠেকছে লোকের চোখে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তার জন্য লজ্জা পেলেন না। লজ্জা পাবার অভ্যাস তাঁর নেই।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "পুলিসের কাজ একটু অন্যরকম হয়। সবসময় সোজা পথে চললে আমাদের চলে না। ঠিক আছে, লখীন্দরকে একবার ডাকুন।"

আবার সামন্তর ইঙ্গিতে একজন বেরিয়ে যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেশ ছমছমে চেহারা এক ছোকরা তাঁবুতে ঢুকে কুন্দকুসুমকে নমস্কার করে দাঁড়ায়।

কুন্দকুসুম চোখ দিয়ে লোকটাকে মেপে নিচ্ছিলেন। আড়েদিঘে লোকটা অবিকল লখীন্দরের মাপসই বটে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কুন্দকুসুমের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা আসল লখীন্দরের একটু বেশি মাত্রায় ছোট ছিল। তিনি একটু বিস্ময়ের গলায় বললেন, "এই কি সেই?"

"আজ্ঞে। দলছুট হয়ে গিয়েছিল। ওর ঠাকুমার খুব অসুখ। তাঁকে দেখতে দেশের বাড়িতে যাওয়ায় এখানে প্রথমে খেলা দেখাতে পারেনি। অদ্য ফিরেছে।"

"হুঁ।" বলে কুন্দকুসুম ছেলেটার দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার নাম কী?"

"লখীন্দর। লখীন্দর কর্মকার।"

"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।"

কুন্দকুসুম যে সন্তুষ্ট হননি, তা টের পেল সামন্ত। মুখে উদ্বেগটা বাড়ল। বলল, "লুচি ভাজা হচ্ছে। একটু বসে যান দারোগাবাবু।"

"নাঃ, কাজ আছে।" বলে কুন্দকুসুম উঠলেন।

বাড়িতে ফিরে সেদিন কুন্দকুসুম তাঁর দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবরকে খুব পেটালেন, পড়ার টেবিলে বসে কাটাকুটি খেলছিল বলে। আসলে সেটা কারণ নয়। খুব রেগে গেলে কুন্দকুসুমের রাগ পড়ে একমাত্র কাউকে ধরে বেধড়ক পেটালে।

বাসায় এসে তিনি আড়কাঠিকে ডেকে পাঠালেন। সুড়ুঙ্গে চেহারার ধূর্ত লোকটা এসে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর খবর ঠিক তো?"

"আজ্ঞে, একদম পাকা।"

"সামন্ত কিন্তু অন্য এক ছোকরাকে দেখাল।"

"সামন্ত খুনিটাকে আড়াল করছে।"

"আচ্ছা যা। চোখ-কান খোলা রাখিস।"

ooo

যুধিষ্ঠির রায় সকালবেলায় যথারীতি পড়াতে এসেছেন। নিপাট ভালমানুষ। সাদা ধুতি আর সাদা শার্ট পরনে। অল্পবয়সী। চোখেমুখে লেখাপড়া এবং বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে দোষের মধ্যে জর্দা দেওয়া পান খান।

উদ্ধববাবু তক্কে-তক্কে ছিলেন। কাছারি-ঘরে মক্কেলদের ভিড় ছিল খুবই। তবু এক ফাঁকে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে হানা দিলেন। উদ্ধববাবু কোনোরকম নেশা পছন্দ করেন না। তিনি নিজে সুপুরিটা পর্যন্ত খান না। বাচ্চাদের পড়ার ঘর জর্দার গন্ধে ম-ম করছে। তিনি একটু নাক কোঁচকালেন। গন্ধটা খারাপ নয়। বরং বেশ ভাল দামি আতরের গন্ধই। কিন্তু বাচ্চাদের শিক্ষকরা যদি নেশা-টেশা করেন, তাহলে শিশু-মস্তিষ্কে তার প্রভাব পড়তে পারে।

উদ্ধববাবু গলা খাঁকারি দিলেন। যুধিষ্ঠির খুব নিবিষ্ট মনে রামুকে অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। শব্দ শুনে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "কিছু বলবেন?"

উদ্ধববাবু ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষকদের সম্মান করতে শিখেছেন। তাঁর মতে দেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ হলেন শিক্ষকেরা। রাষ্ট্রের উচিত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির

চেয়ে শিক্ষকদের বেশি সম্মান দেওয়া। নইলে শিক্ষকের ওপর ছাত্রদের শ্রদ্ধা আসে না। আর শ্রদ্ধা ছাড়া জ্ঞান আসবে কী করে?

উদ্ধববাবু খুব বিনীতভাবে হাতজোড় করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আজ্ঞে কথা সামান্যই। আপনার ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। বসুন।"

যুধিষ্ঠির বসলেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কথাটা কীভাবে শুরু করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি উকিল মানুষ। পাজি-বদমাশ খুনে দেখে-দেখে চোখ পেকে গেছে। সেই অভিজ্ঞ চোখে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কোনো খুনির লক্ষণ দেখলেন না।

উদ্ধববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "ইয়ে, আপনার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে দেখছি।"

"আজ্ঞে। পান খেলে আমার কনসেন-ট্রেশনটা ভাল হয়।"

"তা ভালই। ইয়ে, বলছিলাম কী, আপনি কি রাত্রিবেলাও পান-জর্দা খান?"

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বলেন, "আজ্ঞে না! সারাদিনে এই সকালবেলাই একটা। ব্যস।"

উদ্ধব মাথা চুলকে বললেন, "গবাটা যে কী সব আবোল-তাবোল বকে তার ঠিক নেই।"

"গবা কে?"

"ওই একটা পাগল আছে। এ-বাড়িতেই থাকে।"

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, "গবা পাগলা? ওঃ হোঃ, তার কথা খুব শুনেছি। লোকে বলে লোকটা নাকি ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক। তার সঙ্গে একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে আছে।"

উদ্ধববাবু দুম করে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া আছে, তা কি আপনি জানেন?"

যুধিষ্ঠির আরো একটু অবাক হয়ে বললেন, "জানি বই কী। রামুর কাছে শুনছিলাম আপনাদের কাকাতুয়াটা নাকি গুপ্তধনের কথা বলে।"

উদ্ধববাবু একটু রাগত চোখে রামুর দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাতে আপনার ভাল

ঘুম হয়েছিল তো?"

উদ্ধববাবুর ছেলেমেয়েরাও পড়া ভুলে বাবার দিকে চেয়েছিল। এবার তারা নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করতে লাগল। যুধিষ্ঠিরও খুব অস্বস্তি বোধ করছেন! পান, কাকাতুয়া, ঘুম এসব অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে তারা সবাই অবাক।

উদ্ধববাবুও বুঝতে পারছেন, আদালতে দাঁড়িয়ে যত ভাল সওয়ালই করুন না কেন, আজ ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে সওয়াল-জবাব করতে গিয়ে তিনি নিতান্ত আহাম্মক বা পাগল বলে প্রমাণ হচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির অবাক হলেও কথায় তা প্রকাশ করলেন না। বিনীত ভাবেই বললেন, "আজ্ঞে আমার বরাবরই ভাল ঘুম হয়। কাল রাতেও মড়ার মতো ঘুমিয়েছি।"

"বেশ বেশ।" বলে উদ্ধববাবু তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। গবাটাকে হাতের কাছে পেলে মাথায় কষে একটা গাঁট্টা লাগাতেন।

কিন্তু গবা হাতের কাছে ছিল না।

(ক্রমশ)

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

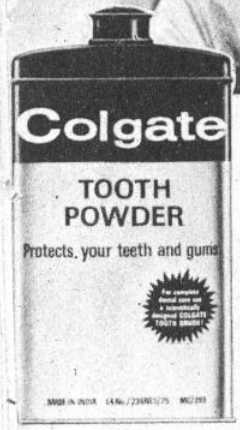

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেণ্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

শিশিরকুমার বসু

॥ ২১ ॥

রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে খেতে বসেছি কার্শিয়াঙে আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে। কালু সিং ইউরোপীয় ধাঁচের খাবার দিচ্ছে, প্রথমেই সুপ। আমরা তো সুপের বাটিটা উল্টো দিকে কাত করে নিয়ে চামচে করে সুপ খেতে অভ্যস্ত। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু সুপের বাটিটা নিজের দিকে কাত করে খাচ্ছেন। বললেন, "তোমরা বাটিটা উল্টো দিকে কাত করে খাচ্ছ কেন?" ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি। মুচকি হেসে বললেন, "তোমরা যেমন করে খাচ্ছ সেটা তো ইংরেজি কায়দা, ইউরোপের অন্যান্য দেশে কিন্তু আমি যেমন করে খাচ্ছি তেমনি করে খায়।"

আমরা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আচার-ব্যবহারে, অভ্যাসে ও রুচিতে, ইংরেজদের অন্ধ অনুসরণ করি, সেটা রাঙা-কাকাবাবু সুস্থ ও মুক্ত মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করতেন না। অনেক দিনের দাসত্বের ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিই। ছোটখাটো দৃষ্টান্ত দিয়ে রাঙাকাকাবাবু আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন যে, সব বিষয়ে ইংরেজদের অনুকরণের স্পৃহা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ইউ-রোপে থাকার ফলে রাঙাকাকাবাবু মধ্য-ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মানদের, কৃষ্টি শিক্ষা ও জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদির দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া মধ্য ইউরোপের ভারতপ্রেমী বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বুঝেছিলেন যে, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সমানে-সমানে হতে পারে। কারণ সেখানে প্রভু-প্রজার সম্পর্কের লেশমাত্র নেই। জার্মান পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদরা বহুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অপর

কার্শিয়াঙে সুভাষচন্দ্র (লেখকের তোলা ফোটো)

পক্ষে ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিলেন মূলত ব্যবসা করতে এবং শেষ পর্যন্ত রাজা হয়ে বসেছিলেন। দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক।

আমি যে-সময়ের কথা বলছি তখন রাঙাকাকাবাবু কার্শিয়াঙে আমাদের বাড়িতে বন্দী হয়ে রয়েছেন, এবং আমি ও আমার দাদা অমিয়নাথ সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গরমের ছুটি কাটাচ্ছি। বছর দুয়েক আগে বাবা নিজের বাড়িতে বন্দী-জীবন কাটিয়ে গেছেন। রাঙাকাকাবাবুর ওপরও শর্ত ও বিধিনিষেধ ঠিক একই রকম ছিল। দেখা করা বা কথা বলা কারুর সঙ্গেই চলবে না। পুলিস-পাহারা বেশ কড়া। হিলকার্ট রোডে একমাইল উপর দিকে ও একমাইল নীচের দিকে বেড়াতে পারতেন, পেছন-পেছন বন্দুকধারী পুলিস তাঁকে অনুসরণ করত। আমাদের তো কোনো কাজ নেই, কেবল রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া ও গল্প করা। তবে আমি তখনও পর্যন্ত কথা বলতাম খুব কম, সেজন্য রাঙাকাকাবাবু আমাকে 'সাইলেন্ট বয়' আখ্যা দিয়েছিলেন।

'সাইলেন্ট' হবার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও আছে। কথাবার্তা কম বললে পারিবারিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হয়। তবে চুপচাপ থেকেও যদি চোখ, কান ও মন খুলে রাখা যায়, এবং একাগ্র হয়ে সব-কিছু বিচার করা যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত লাভ বই লোকসান হয় না। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমি তো অনেকদিন খোলাখুলি বাক্যালাপ করতে পারতাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আমি এত অকপটে কথাবার্তা বলেছি যে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। কথাবার্তা কম বলার আর-একটা বড় লাভ হচ্ছে গভীর চিন্তার অবকাশ পাওয়া। অনেক বড় হবার পরেও এবং হাজার কাজের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেন। গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে থাকতে দেখেছি তিনি কেমন টুকরো-টুকরো কাগজে কথার জবাব লিখে লিখে দিচ্ছেন—তা প্রশ্নকর্তা যিনিই হোন না কেন। মনে আছে বাড়িতে একদিন চায়ের আসরে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বাবাও আছেন। কেউ বললেন ব্যারিস্টারি করা আমার দ্বারা হবে না, কারণ আমি বড়ই 'কুনো', মুখে তো কথাই ফোটে না। বাবা কিন্তু বললেন, ওর আইনব্যবসার 'গুরুজি' স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ছেলে-বেলায় নাকি খুবই লাজুক ছিলেন, এবং কথাবার্তায় পটু ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত বড় ব্যারিস্টার হয়েছিলেন।

গল ব্লাডার অপারেশনের পর বেশ কিছুদিন হজমের দিক থেকে অসুবিধা থাকে। পরে নিজের একই অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সেটা ভাল করে বুঝতে পারি। রাঙাকাকাবাবুকে সেজন্য ১৯৩৬ সালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকতে হত। কালু সিং খুব সাদা-সিধে ইউরোপীয় ধরনের খাবার তৈরি করে দিত। উপায় নেই তো, সে অন্য কথা—কিন্তু আমার মনে হয়, রাঙাকাকাবাবুর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হত। কারণ, মুখরোচক সুস্বাদু খাবার তিনি খুব উপভোগ করতেন, এবং দেখেছি, সময়-সময় অতিরিক্ত পরিমাণ খেয়ে ফেলতেন। খেয়ে হাঁসফাঁস করতেন আর

বলতেন, "ও খাবারগুলো পেটের মধ্যে দমে বসে আছে!" কড়াইশুটির কচুরি, শিঙাড়া, চিকেন কাটলেট ইত্যাদি সামনে দেখলে তাঁর মুখে বেশ আনন্দের ভাব ফুটে উঠত।

১৯৩৭ সালে পুজোর সময় বাবা, রাঙাকাকাবাবু ও আমরা ভাইবোনেরা প্রায় সকলে কার্শিয়ঙে একসঙ্গে ছিলাম। তখন যেন দুই ভাইয়ে খাওয়ার কম্পিটিশন। বাবার মিষ্টি কম খাওয়ার কথা, কিন্তু মিষ্টি তিনি খাবেনই। রাঙাকাকাবাবুর গুরুপাক ভাজা মুখরোচক জিনিস খেলে অসুবিধা হয়, কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। বাজারের মুখরোচক খাবারও তিনি সুযোগ পেলেই খেতেন। ১৯৩৭-এর এপ্রিলে মুক্তি পাবার পর এলগিন রোডের বাড়িতে তিনি দাদাভাইয়ের ঘরে থাকতেন। সেই ঘরটি বর্তমানে 'নেতাজি ভবনে' নেতাজির ঘর বলে পরিচিত। ঠিক পাশের ঘরেই থাকতেন মা-জননী। দুপুর-বেলা সামনের রাস্তা দিয়ে 'হট প্যাটিস' ফেরি করে যেত। বাড়ির সামনে প্যাটি কিনলে তো মা-জননী দেখে ফেলতে পারেন। সুতরাং রাঙাকাকাবাবু পাশের গলিতে ফেরিওয়ালাকে বসিয়ে চুপিসারে প্যাটি কিনিয়ে আনতেন ও ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করে খেতেন।

বন্দী অবস্থায় কার্শিয়ঙে রাঙাকাকাবাবুর সকাল-সন্ধে বেড়ানো চাই। জুন মাস, বর্ষা নেমে গিয়েছে। পাহাড়ের বৃষ্টি কি ছাতা বর্ষাতির বাধা মানে? তা ছাড়া হিল-কার্ট রোডে তো নদীর স্রোতের মতো জল বয়ে চলেছে। তাতে কী? বেড়াতে বেরোতেই হবে। আর বেড়াতে বেড়াতে কত গল্প! ছেলেবেলার গল্প, পারিবারিক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা, নানা লোকের চরিত্র বিশ্লেষণ, দেশের কথা, বিশ্বরাজনীতির কথা ইত্যাদি। খানিকটা দুঃখের সুরে হয়তো বললেন, "জানো, আমি যখন ছোট ছিলাম, প্রায় সকলেই বলত, আরে ওটা একটা বদ্ধ পাগল, জীবনে ওর কিছুই হবে না।" আমি মনে-মনে ভাবতাম, কথাটা তো পুরোপুরি ভুল নয়, পাগলামির তো চূড়ান্ত দেখছি, আর সাধারণ মানুষে যাকে 'কিছু হওয়া' বলে তা তো সুভাষচন্দ্রের কিছুই হয়নি। অসাধারণত্ব ও পাগলামির ব্যবধান বোধহয় অল্পই। (ক্রমশ)

ছবির মজা

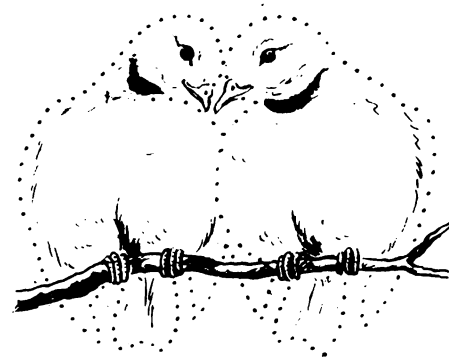

লাইন টেনে ফুটকিগুলো জুড়ে দাও। এবারে পাখি দুটিকে রঙ-পেনসিল বুলিয়ে রঙিন করো।

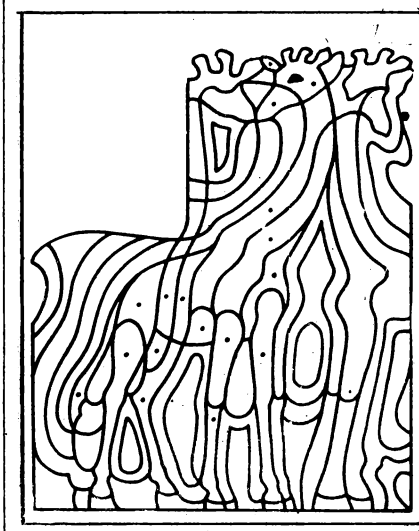

ফুটকি-দেওয়া খোপগুলি রঙ-পেনসিল দিয়ে ভরাট করলেই জিরাফের চেহারা স্পষ্ট হবে।

পাহাড় পেরিয়ে এগিয়ে আসছে
সাত হাজার বিজাপুরী ফৌজ

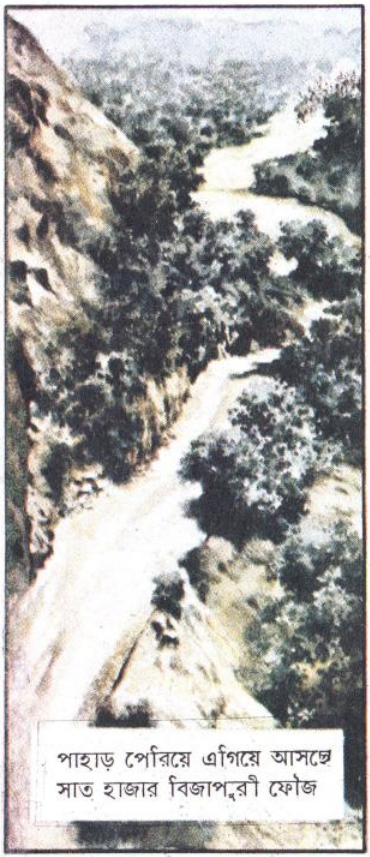

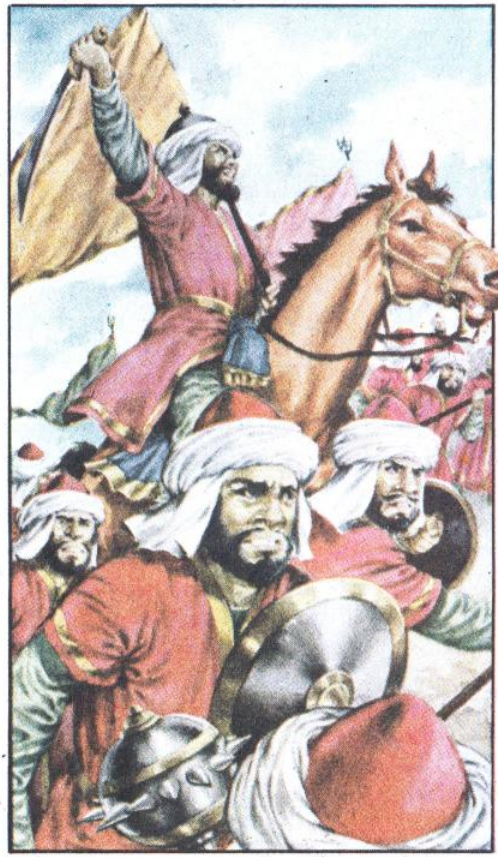

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনাল। রোভার্স বনাম আলখোভিন। ফল ১—১। খেলা চলছে···
গোলে শট নাও, রয়!
নাঃ ডিফেন্স দুর্ভেদ্য!
রয় হেড করেছে!
নাও গাইল্‌স!
গোল হবেই!
গাইল্‌স ইতস্তত করায় গোল হল না
করলে কী?
যাঃ!
সুযোগ নষ্ট হল!
যোহান সীগ্রানের মুখে হাসি ফুটছে...
ফ্রান্সিস আর ম্যাকডোনাল্ডের সাহায্য এবারে পাচ্ছ না···
হুম!
ইংল্যান্ড বনাম হল্যান্ডের খেলার কথা বলছে বুঝি?
হ্যাঁ, সেবারে ৫—১ গোলে জিতেছিলুম!
এবারে ওরা প্রতিশোধ নিতে চায়!
আলখোভিন!
দারুণ খেলা!
লক্ষ-লক্ষ লোক টিভিতে খেলা দেখছে
রুক!
কেপেল!
ভকারের পায়ে বল! বিপদ ঘটবে!

সাঁগ্রান বল পাবামাত্র.....
গো-ও-ও-ও-ল!
রোভার্স ১ আলখোভিন ২
বিরতির সময়ে.....
ঘাবড়ে যেও না, লড়তে হবে!
গোল শোধ করে দেব!
মনে হচ্ছে, পুরনো ট্যাকটিকসে ফিরতে হবে
সেটাই ভাল!
খেলা আবার শুরু হয়েছে
রোভার্স খুব ঠান্ডা-মাথায় খেলছে!
কিন্তু বল যে ওদিকে যাচ্ছেই না।
হঠাৎ...
জোর বাঁচিয়েছে চার্লি!
ওঃ!
তারপরেই...
এইবার, চার্লি!
এই নাও!
শাবাশ রয়, এগোও!
রয় বিদ্যুৎ-বেগে এগোচ্ছে!
ক্রস-ফিল্ড পাস!
কে ধরবে?
গাইল্‌স!
আবার না ইতস্তত করে!
গোল শোধ করার সুবর্ণ-সুযোগ!
এর পর আগামী সংখ্যায়

শুরু হল

নতুন অ্যাডভেঞ্চার

কালো সোনার দেশে

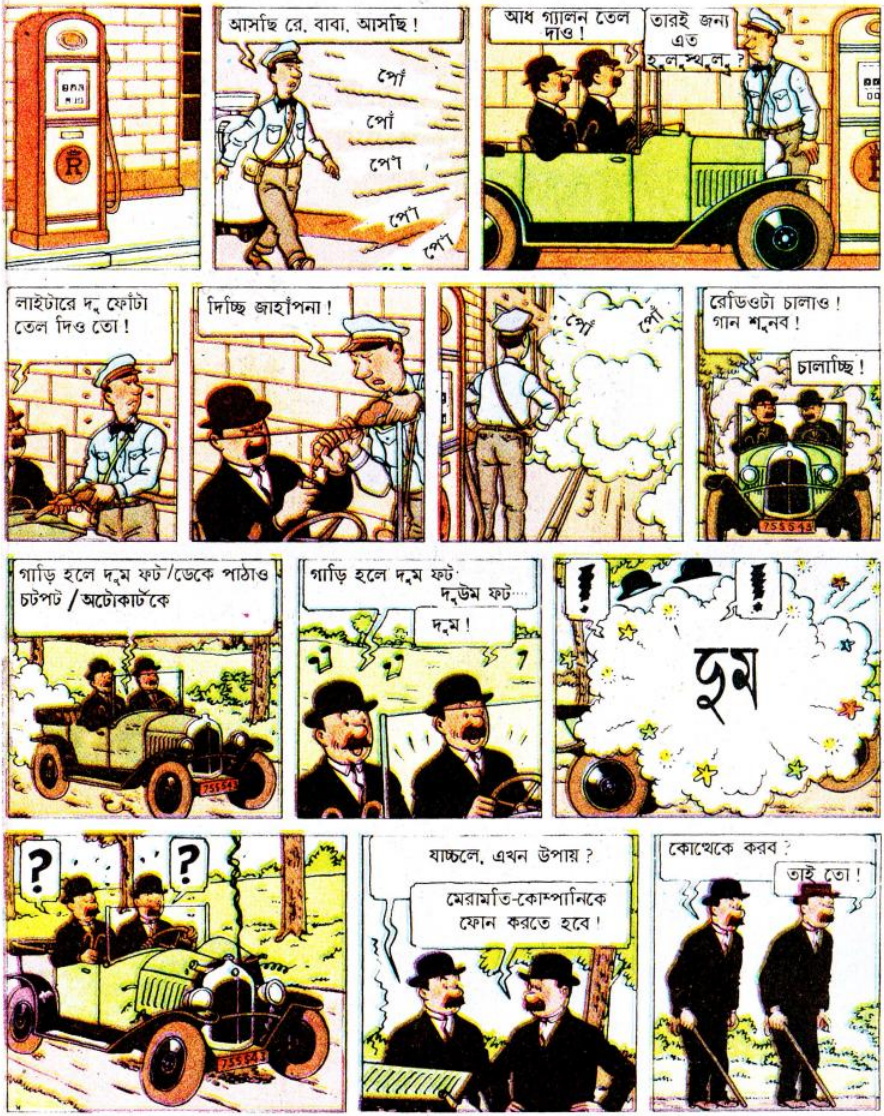

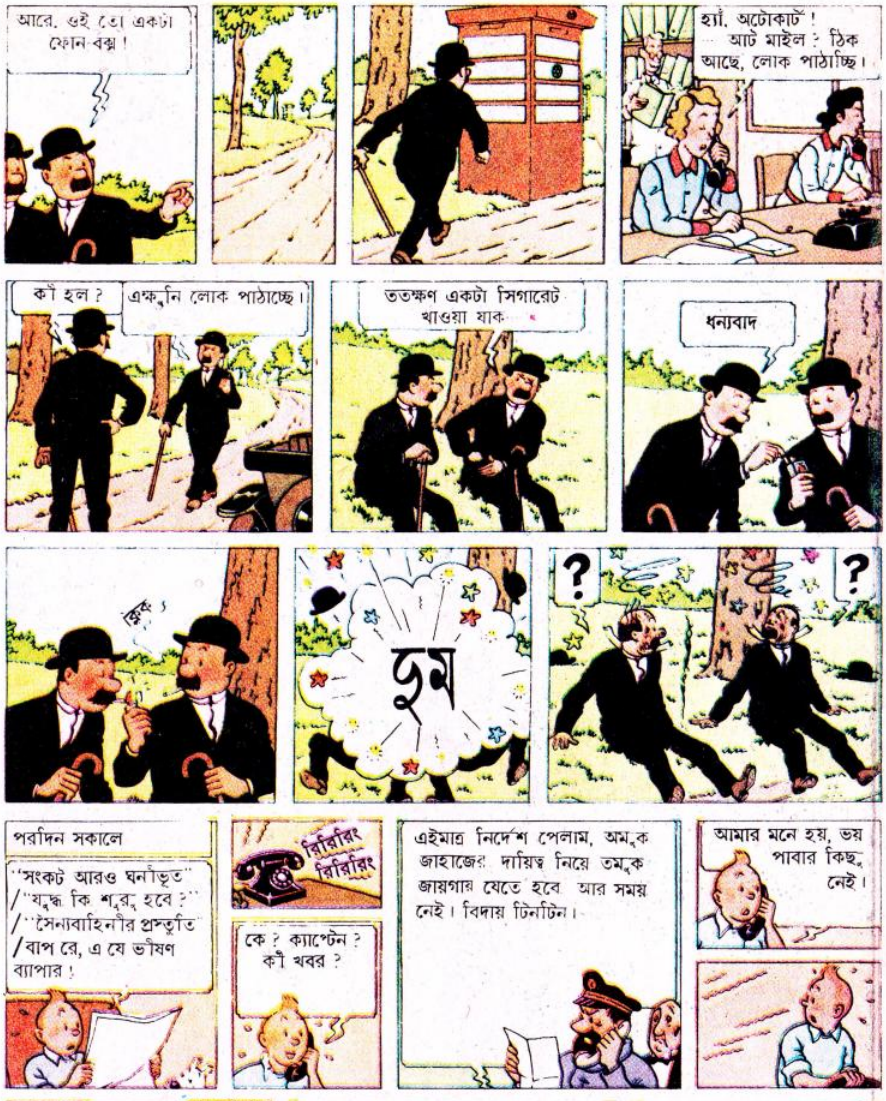

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২			৩	৪	৫
৬					৭	
		৮		৯		
		১০				
১১						১২
১৩	১৪				১৫	
১৬				১৭		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পদ্ম বা শালুক। (৩) দুরন্ত। (৬) পায়ের শিকল। (৭) ছোট পাহাড়। (১০) জলজ শাক। (১৩) গীতিকবিতা বিশেষ। (১৫) দুধেও পড়ে, জলেও পড়ে। (১৬) যার দৌলতে নতুন বই নজর কাড়ে। (১৭) কিরণ।

উপর-নীচ : (১) ধনদেবতা। (২) চালভাজা-জাতীয়। (৪) যার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা প্রবচনে 'খাঁটি' শব্দটার প্রয়োগ হয়। (৫) কপাল। (৮) ফারসি উপসর্গের সঙ্গে ইংরাজি শব্দ জোড় বেঁধে বাংলা শব্দভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছে। (৯) প্রাচীন ভারতের একটি দেশ। (১১) ঘোড়াকে বশে রাখতে গেলে দরকার হয়। (১২) কুঠার। (১৪) চোরের উপর রাগ করে যার অভাবে কেউ মাটিতে ভাতা খায়। (১৫) যার সাজ দেখলে হাসি পায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

নো	না				ঘো	গ
	বা	কু		প্র	ল	য়
শূ	ল			বা		না
	ক	বি		ল	ঘু	
ত		রা			ল	ওকা
ম	গ	ধ		ঘু	ঘু	
সা	দা				লি	চু

ধাঁধা

পল্টুদা বড়, মেজর নাম তাপস, আর সব-ছোট গৌতম। তিন ভাই। থাকে আমাদের দু-তিনটি বাড়ি পরেই।

ব্যাপার হল কী, তিন ভাইকে ছোটপিসি ২৪ টাকা পাঠিয়েছেন মানিঅর্ডার করে। বছর তিনেক আগে ওদের ছোটপিসি এসেছিল ওদের বাড়িতে। তখনই তিন ভাইকে বলে গিয়েছিল, মিষ্টি খাবার জন্য টাকা পাঠাবে। তা, সেই টাকা এল তিন বছর বাদে। ছোট-পিসি লিখে পাঠিয়েছে, চব্বিশ টাকা পাঠালাম, তিন ভাই ভাগ করে নিয়ো। তিন বছর আগেই টাকাটা দেবার কথা ছিল। তখন নানা কারণে দেওয়া হয়নি। এখন

পাঠাচ্ছি। তিন বছর আগে তোমাদের যার যত বয়স ছিল, সে ততগুলো করে টাকা নিয়ো, চব্বিশ টাকা সেই হিসেবেই পাঠাচ্ছি।

পল্টুদারা হিসেব করে দেখল, ভুল লেখেনি ছোটপিসি। তিন বছর আগে যার যত বয়েস ছিল, সে যদি তত টাকা নেয়, তাহলে চব্বিশ টাকাই লাগে। কিন্তু কেউ কম পায়, কেউ বেশি। যাই হোক, সেভাবেই টাকাটা ভাগ করে নিয়েছিল ওরা।

ছোটুকার সামনেই পল্টুদা সেদিন ব্যাপারটা বলল। তিনভাই ছিল, টাকাও ছিল সঙ্গে। ছোটুকা শুনে তিন ভাইকে যা বলল, সেটা খুব মজার। ছোটুকা বলল, "গৌতম, তুমি যা পেয়েছ, তার অর্ধেক রেখে বাকি টাকা মেজদা আর বড়দার মধ্যে প্রথমে সমান ভাগ করে দাও। এরপর তাপসের পালা। তাপস, তোমার নিজের টাকা আর গৌতমের দেওয়া টাকা এক করে ফেলে দু-ভাগ কর ফ্যালো। তারপর তার অর্ধেক তুমি নিজে রাখো, বাকিটা সমান দু-ভাগ করে পল্টু আর গৌতমকে দিয়ে দাও। সবশেষে পল্টু, তুমিও একই ভাবে পিসির পাঠানো টাকা আর ভাইদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা যোগ করে অর্ধেক নিজের জন্য রাখো, বাকি অর্ধেকটা তাপস আর গৌতমের মধ্যে সমান ভাগ করে দাও।"

ছোটুকার কথামতো গৌতম, তাপস আর পল্টুদা আমাদের সামনেই নতুন করে পিসির পাঠানো টাকা ভাগাভাগি করল। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার, এই নতুন ভাবে ভাগাভাগির পর দেখা গেল, প্রত্যেক ভাইয়ের ভাগে শেষ পর্যন্ত পড়ছে ৮ টাকা। অর্থাৎ ২৪ টাকা সমান তিনভাগে ভাগ হয়ে গেল।

এ-থেকে বলতে পারো, তিন ভাইয়ের এখনকার বয়স কত ? হ্যাঁ, প্রত্যেকের বয়স বার করতে হবে। এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ টেবিলে তিনটে মাত্র দেশলাইকাঠি রয়েছে। চট করে তিনকে চার করে ফেলতে পারো ? মনে রেখো, কোনো কাঠি ভাঙা চলবে না। তাহলে ? সেটাই তো ধাঁধা।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়িয়ে আসল শব্দটা বার করো—

জড়গধবরু

চতুর্থ ধাঁধা ॥ গাল-এর আগে কোন্ শব্দ বসালে হাতের সামনে আনা যায় ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) বাজির শুরুতে ২১ টাকা ছিল লোকটির কাছে। (২) ১৮ টাকা। (৩) পিনাকপাণি, মানে শিব। (৪) 'ভুল' শব্দটা।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

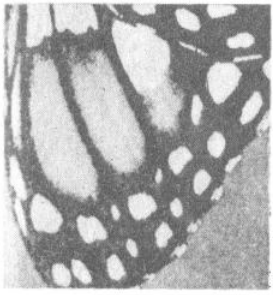

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল নারকেল-ছোবড়ার দড়ির ফোটো

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ জিনিস জন্মাবার আগেও মানুষের খাদ্য, মৃত্যুর পরেও তাই।

উঃ মুরগি।

প্রঃ তুমি ডাক্তার দেখাবে বলে ছুটি নিয়ে গেলে, শুনছি তুমি নাকি ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েছিলে?

উঃ আজ্ঞে, ওপেনিং ব্যাটসম্যানটি আসলে ডাক্তার, ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর খেলা দেখাতে।

প্রঃ একজন ম্যাজিশিয়ান সাধারণ একটি লেড-পেনসিল হাতে নিয়ে প্রথমে দর্শকদের সেটা ভাল করে পরীক্ষা করতে দিল। তারপর ঘোষণা করল, 'এটা দিয়ে আমি সব রং লিখতে পারি।' তাই কি পারে?

উঃ কেন পারবে না। ল-এ আকারে লা আর ল লাল, এ-রকম বানান করে লিখবে।

এশিয়ার সব রাস্তা কোথায় গিয়ে মিশেছে?

রোডেশিয়ায়!

সুসেন

মজার খেলা

কাগজ-পেনসিল হাতে ধরিয়ে দাও কোনো বন্ধুর। এরপর তাকে বলো, তোমাকে না জানিয়ে সে যেন কাগজের ওপর পছন্দ-করা একটা সংখ্যা লেখে। এবার তাকে বলো, তার পছন্দ-করা সংখ্যাটাকে সে যেন প্রথমে ৭ দিয়ে গুণ করে। গুণ হয়েছে কিনা জেনে নাও। হয়েছে জানার পর, সেই গুণফলকে বলো ২ দিয়ে ফের গুণ করতে। গুণ করা হয়েছে কিনা জেনে নাও। এবার বলো, বন্ধু যেন তার পছন্দ-করা সংখ্যা দিয়ে শেষ গুণফলকে ভাগ করে ফেলে। ভাগ হয়েছে কিনা জেনে নাও। তারপর বলো, ভাগফলের সঙ্গে বন্ধু যেন তার পছন্দ-করা সংখ্যাটা যোগ করে ফেলে।

বন্ধু এই চূড়ান্ত উত্তরটাই তোমাকে শুধু বলবে। আর তাই শুনে তুমি চটপট বলে দেবে, বন্ধু কত ভেবেছিল প্রথমে।

কী করে পারবে ভাবছ? কিছু না, যেমন-যেমন বলে গেলাম, তেমন-তেমন করতে বলো কোনো বন্ধুকে। তারপর চূড়ান্ত উত্তরটা শুনে তার থেকে ১৪ বিয়োগ দিয়ে দাও মনে-মনে। বিয়োগফলই হবে তোমার বন্ধুর পছন্দ-করা সংখ্যা। হবেই।

উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরো বন্ধু পছন্দ করেছে ২০। তাহলে তোমার নির্দেশ অনুসারে তার প্রথমে হল ২০ × ৭ = ১৪০। তারপর হল—১৪০ × ২ = ২৮০। তারপর হল ২৮০ ÷ ২০ = ১৪। তারপর হল ২০ + ১৪ = ৩৪। এই ৩৪ সংখ্যাটাই সে বলবে তোমাকে। আর তুমি ৩৪ থেকে মনে মনে ১৪ বিয়োগ দিয়ে বলে ফেলবে যে, ২০ হচ্ছে বন্ধুর পছন্দ করা সংখ্যা। এই খেলাটার একটা নিয়ম রয়েছে। তোমরা যদি সে-নিয়ম নিজেরা বার করতে পারো, নানান ভাবে দেখাতে পারবে খেলাটা। না পারলে, পরের বার নিয়মটা না-হয় শিখিয়ে দেব। কেমন? খেলাটা ততদিন দেখাও।

মজারু

হাসিখুশি

টিকিট-পরীক্ষক : দয়া করে আপনার টিকিটটা একটু দেখাবেন?

রেলযাত্রী : টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি স্যার।

টিকিট-পরীক্ষক : টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছেন, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?"

রেলযাত্রী : না, আমি ঠিক এ-ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

টিকিট-পরীক্ষক : আপনি কি আদৌ টিকিট কেটেছিলেন?

রেলযাত্রী : আমি এ-ব্যাপারেও ঠিক নিশ্চিত নই।

টিকিট-পরীক্ষক : টিকিট কেনার মতো টাকা ছিল আপনার কাছে?

রেলযাত্রী : মাফ করবেন স্যার, এ-ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত নই।

টিকিট-পরীক্ষক : আপনি তা হলে কিসে নিশ্চিত?

রেলযাত্রী : আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে, টিকিট ছাড়াই আমি রেলে ভ্রমণ করছি।

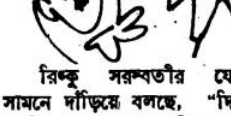

রিঙ্কু সরস্বতীর ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, "দিদিমা, আমি যেন অঙ্ক-পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করি।" শুনে খুব অবাক হয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন রিঙ্কুকে, "এ কী রে, মা সরস্বতীকে তুই দিদিমা বলছিস কেন? তুই কি পাগল নাকি?"

মা'র কথায় রিঙ্কু আরও অবাক হয়ে বলল, "বা রে, বলব না কেন? তুমি যে সেদিন দাদা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সরস্বতীকে নমস্কার করে বলেছিলে, মা গো, পল্টু যেন পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করে। সরস্বতী যদি তোমার মা হন, তা হলে আমার দিদিমা হবেন না? তুমি কী বোকা, মা।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ভিন্‌দেশী এক ছোট্ট গাঁয়ে

মহাশ্বেতা চৌধুরী

॥২॥

গ্রামের শান্ত জীবন গ্রাম্য নদীটির মতোই বয়ে চলেছে। অধ্যাপক মার্শাল জানালেন, তাঁর লেখার সময় হলেই তিনি এখানে চলে আসেন। লেখার এমন আদর্শ জায়গা আর কোথায় হতে পারে? পৃথিবীর বড় বড় লেখকরা অনেকেই লেখার সময় গোলমাল থেকে দূরে সমুদ্রতীরের কুটিরে বা পাহাড়ের নির্জনতায় চলে যান। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকটা চড়াই রাস্তায় চলে এসেছি। আরো একটু ওপরে উঠে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেখানে বড় গাছ খুব বেশি নেই। প্রায় টিলার মতো উঁচু এই জায়গা থেকে গ্রামটিকে সুন্দর একটি ছবি বলে মনে হচ্ছিল। সবুজ—যতদূর চোখ যায় সবুজ আর মাঝে মাঝে ছবির মতো ছোট ছোট বাড়ি। সঙ্গে টুকরো টুকরো ফুলবাহারি বাগান। বেশির ভাগ বাড়িতেই মরসুমি ফুলের সঙ্গে গোলাপও আছে বিভিন্ন জাতের। বাগান-করা এদেশের জাতিগত নেশা। নিজের হাতে একটি ফুল ফোটাতে পারলেই কী আনন্দ সবার। আমাদের আধা-সংসারী অধ্যাপকও তাঁর চিলতে জমিতে কিছু ফুল, এমন-কী গাজর বীন ইত্যাদি সবজিও ফলিয়েছেন। চলতে চলতে একটি বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। প্রায় মধ্যযুগীয় কালোমতো একটি কাঠের বাড়ির বাইরে ফলকে লেখা আছে, বাড়িটি ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। আদি মালিকের পর বহুবার হাতবদল হলেও ঐ ফলকটি সবাই সযত্নে রেখে দিয়েছে। ভেতরে আধুনিকীকরণ নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু চেহারাটি প্রায় অবিকৃতই আছে। প্রাচীনতার এত সম্মান, এত সযত্ন সংরক্ষণ বোধহয় আর কোনো দেশে নেই। পুরনো যুগের একটি বাক্স, চেয়ার এমন-কী একটি চামচ পর্যন্ত সবাই কী গর্বভরে দেখায়। ন'শো বছরের পুরনো কুটিরটির গায়ে লতানো গোলাপ

অধ্যাপকের বাড়ি. সামনে নদী

বাড়ির পিছনে সবজি-বাগান

গাছ উঠে গেছে। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে উঠে বারান্দা-ঘর, আমাদের দেশের মাটির বাড়িতে যেমন উঁচু দাওয়া দেখা যায়। অধ্যাপকের কুটিরটি কিন্তু বেশ নিচু, ফলে খুব নাকি ঠাণ্ডা হয় শীতকালে। বরফ পড়লে বেরনোও মুশকিল হয়। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি বাড়িটি দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। মন্দির, প্রাসাদ, ঐতিহাসিক বড় বড় স্থাপত্য প্রাচীন বলে সংরক্ষিত হয়, কিন্তু অতি সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের একটি বাড়ি যে এতদিন ধ্বংস না করে মানুষ বাস-যোগ্য মনে করে এটাই আশ্চর্য। আমাদের দেশে তো একটি বাড়ি দুই-তিন পুরুষের পরই ভেঙে পড়ে বা অনেক সময় জোর করে ভেঙে ফেলা হয়।

গ্রাম ঘুরে ফেরার সময় অতি প্রাচীন গির্জাটি দেখলাম। ইউরোপের পুরনো গির্জার মতো এটিও পাথরের। মনে হল মধ্যযুগীয় স্থাপত্য। ভেতরে গেলাম, খ্রীষ্টান রীতি অনুযায়ী সমাহিত বহু মানুষের সমাধিপ্রস্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে। প্রথম প্রথম আমার বড় সঙ্কোচ হত, কিন্তু এতে নাকি আত্মার শান্তি হয়। প্রধান উপাসনা-মন্দিরটি অভ্যন্তরে। চারিদিকের জানলায় রঙিন কাচের ছবি, খ্রীষ্ট বা সন্তদের জীবন নিয়ে। সামনে উঁচু বেদীতে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি, ধর্মযাজকের উপাসনা ও ধর্মালোচনার জায়গা। প্রাচীনকালে দেওয়ালগুলি এমনভাবে তৈরি হত যে প্রতিধ্বনি ফিরে এসে কণ্ঠস্বর আরো জোরালো শোনাত বিশাল একটি অর্গ্যান রয়েছে প্রধান বেদীর একপাশে। প্রার্থনাসঙ্গীতের সময় যখন এটি বাজানো হয় সমবেত সেই উদাত্তধ্বনি বহুদূর পৌঁছোয়। শুধু ধর্মের নয়, গির্জা গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধারারও প্রাণকেন্দ্র। এখনকার জীবনে আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা, সেবাকার্য এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, রাষ্ট্রও সে কাজে সাহায্য করে। আগে তো তা ছিল না। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে, নগরসভ্যতা প্রসারের আগে গির্জাই ছিল প্রধান কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষা, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পে প্রথম পাঠ, আর্তের সেবা, বিপন্নের ত্রাণকার্য—সবই হত গির্জার পরিচালনায়। এই পুরনো চার্চটিকে দেখে মনে হচ্ছিল এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েক শতাব্দী ধরে কত

মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। অতীতের ঐতিহ্য বহন করে উপাসনা এখনও হয়। তবে আগে যেমন ধর্মযাজক শুধুই ধর্মকথা শোনাতেন না, গ্রামের মানুষের রোগ-শোক আনন্দে সমান অংশ নিতেন, এমন-কী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতেন, এখন গ্রামেও তা নেই। মাঝে মাঝে শুধু মেলা, বিভিন্ন তহবিলের জন্য অনুষ্ঠান এবং রবিবার সকালে প্রার্থনাসভা এখনো হয়। আগে রবিবারের প্রার্থনাসভা ছিল সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র। গ্রামের আপামর রবিবার সকালে সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরে উন্মুখ হয়ে থাকত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে বলে, সংবাদ আদান-প্রদান হবে বলে। এখন সে প্রয়োজন নেই, রবিবারের উপাসনার সে গুরুত্বও আর নেই। কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা ধর্মবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আর যায় না। তবু বড় শহরের তুলনায় গ্রামে চার্চের প্রতি টান এখনও মানুষের আছে। খ্রীষ্টউৎসবের প্রধান অঙ্গ মধ্যরাতের প্রার্থনায় আগে নাকি চার্চে লোক ধরত না, আজ তা ফাঁকাই থাকে। লোকে এখন সেই ছুটিতে বেড়াতে যায়, ভাল খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠান দেখে। পুরনো গির্জাটির বাইরে একটি বড় ঘড়ি রয়েছে, এর প্রাধান্যও কমেছে। গ্রামের মানুষ আগে সময় জানার জন্য গির্জার ঘড়ি বা ঘন্টার ওপর নির্ভর করত, আজ প্রত্যেকের হাতেই ঘড়ি। দেওয়ালে বসানো কালো ও সোনালি রোমান হরফের ঘড়িটি বড় সুন্দর। চার্চের ঘন্টাও আগে অনেক কাজে লাগত। অনেক সুখ-দুঃখের সংকেতবাণী দূরদূরান্তে জানাবার তখন এক-মাত্র উপায় ছিল গির্জার বড় ঘন্টা। আজ তার মূল্য শুধু ঐতিহাসিক।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে চার্চটির ভেতরে ও বাইরে ঘুরছিলাম। বেলা প্রায় চারটে। দিনের আলো অবশ্য এখন নটা পর্যন্ত থাকবে, তবু এই বিলিতি গন্ডগ্রামটি থেকে ফেরার ট্রেন খুব বেশি নেই। তাই ফিরতে হল। অধ্যাপকের বাড়ি এসে চা-পান পর্ব। সঙ্গে প্রতিবেশিনীর তৈরি সুস্বাদু কেক। এঁরাই অধ্যাপকের বাড়িটি দেখাশোনা করেন। এদেশে গ্রাম থেকে যারা রোজ শহরে যায় (আমার পরিচিত অনেকে সুদূর ডেভন বা কেন্ট থেকেও রোজ লন্ডনে যায় কাজ করতে) আবার রাত্রে ফেরে, তাদের বাড়িঘরের জিম্মা-দার প্রতিবেশিরাই। এক বান্ধবীর কাছে শুনেছি, তিনি প্রায়ই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কারো না কারো বাগানের ফুল সাজানো রয়েছে দেখতে পান। জন্মদিনের সন্ধেয় দেখেন অনেকে মিলে সাজি ভরে বিরাট এক ফুলের স্তবক রেখে গেছে, শুভেচ্ছাবাণীটি রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা। বন্ধ ঘরে এমন অপ্রত্যাশিত ফুলের আবির্ভাব কার না ভাল লাগে! আমার এই বান্ধবীও অবশ্য অতিথি আসবে জানলে আমাকে তাঁর ১২০ মাইল দূরের বাড়ি থেকে ফুল এনে দিতেন। বাগান করা তাঁর শখ কেন প্রায় বাতিকই বলা চলে। শিক্ষক বা চাকুরে বহু লোক আবার সারা সপ্তাহ থাকেন না। শুক্রবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত গ্রামে থাকেন। পাঁচদিন পরিশ্রম, দুদিন পূর্ণ বিশ্রাম। থাকার সুবিধা আর শহরে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা— এমন গ্রাম থাকলে কে আর বড় শহরের ঘিঞ্জিতে থাকতে চাইত? প্রকৃতির সঙ্গে দিনে দিনে আমাদের যে ফাঁক গড়ে উঠছে তার জন্য বিজ্ঞানের প্রসারকে দায়ী না করে গ্রামের সুখ-সুবিধা উন্নত করে, শহরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা সুহজতর করে আমরা যদি আবার সারা সপ্তাহ বা অন্তত দু'টো দিন নির্জনে থাকতে পারতাম ভাল হত না? পশু-পাখি গাছপালার সঙ্গে মানুষের যে সহজ সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে তা আবার গড়ে উঠত। এইসব চিন্তা করতে করতে স্টেশন এসে গেল। বেলা ছটা, বাইরে যদিও ঝক-ঝকে রোদ। ট্রেনে উঠে অধ্যাপককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। শহর থেকে অনেক দূরে যে-দেশে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব হয়েছিল সেই দেশে নগরসভ্যতাবর্জিত নিশ্চিন্দিপুরের মতো একটি গ্রাম যে থাকতে পারে তা দেখার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাঁর উৎসাহেই তো সম্ভব হল।

লাল বল

এক ভালুক ছিল। তার একটা ছেলে ছিল। সে বায়নাদার ছিল। একদিন কী হয়েছে, ভালুক আপিস যাবে বলে বেরিয়েছে, এমন সময় তার ছেলে বায়না ধরল তাকে একটা লাল বল কিনে দিতে হবে।

বাবার একমাত্র ছেলে বলে ভালুকভায়া তার অনেক আবদার রাখে। বাস, ভালুক-ভায়ার আপিস যাওয়া মাথায় উঠল। মাসের শেষে কারও হাতে পয়সাকড়ি থাকে না। তাই ভালুক খুব রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল, "মাসের শেষে লাল বল, নীল বল কিছুই হবে না।"

তখন ভালুকছানা বলল, "আমি খাব না, কিচ্ছু করবও না।" এই বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এরকম কান্ড দেখে ভালুকভায়া ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে গেল। ভালুকভায়া তখন বলতে লাগল, "খেয়ে নে বাবা, রাগ করিস না, তোকে আমি লাল নীল বল কিনে দেব।"

পরদিন ভালুক পয়সাকড়ি ধার করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ভালুক কোন পথ দিয়ে শহরে যেতে হয় জানে না। ভালুক সোজা হাঁটতে-হাঁটতে দেখল, শিয়ালপন্ডিত যাচ্ছে। ভালুক শিয়ালভায়াকে জিগ্যেস করল, "শিয়ালভায়া, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

শিয়াল বলল, "আমি পাঠশালায় পড়াতে যাচ্ছি, তা তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

ভালুক বলল, "আমি শহরে যাচ্ছি ছেলের জন্য একটা লাল বল কিনতে, তা তুমি বলতে পারো, কোন পথ শহরে গেছে?"

শিয়াল বলল, "হ্যাঁ, তা বলতে পারি। তুমি সোজা চলে গিয়ে একটু বেঁকে যাও। তাহলে শহর পড়বে।" এই বলে শিয়াল পাঠশালায় রওনা হল।

ভালুক শিয়ালভায়ার কথামতো প্রথমে খানিকটা সোজা গেল, তারপর একটু বাঁকল। কিছু দূরে আলো ও লোকজন দেখা যাচ্ছে। তখন ভালুক বুঝতে পারল যে, ওইখানেই শহর। ভালুকের তখন শহর দেখে খুব ফূর্তি।

একটা দোকানের সামনে এসে দোকানিকে বলল, "দাদা, একটা লাল বল দিন তো।"

দোকানি ভালুকভায়াকে একটা বড় লাল বল এনে দিল। ভালুক বলল, "এই বলটার দাম কত?"

দোকানি বলল, "এক টাকা।"

ভালুক পকেট ঝেড়েঝুড়ে একটা টাকা বার করে দোকানিকে দিল।

বাড়ি এসে ভালুকছানাকে বলটা দিয়ে ভালুক বলল, "আর যদি কোনোদিন বায়না করিস, তাহলে দুই থাপ্পড় লাগাব।"

উত্তীয় জানা (বয়স ১২)

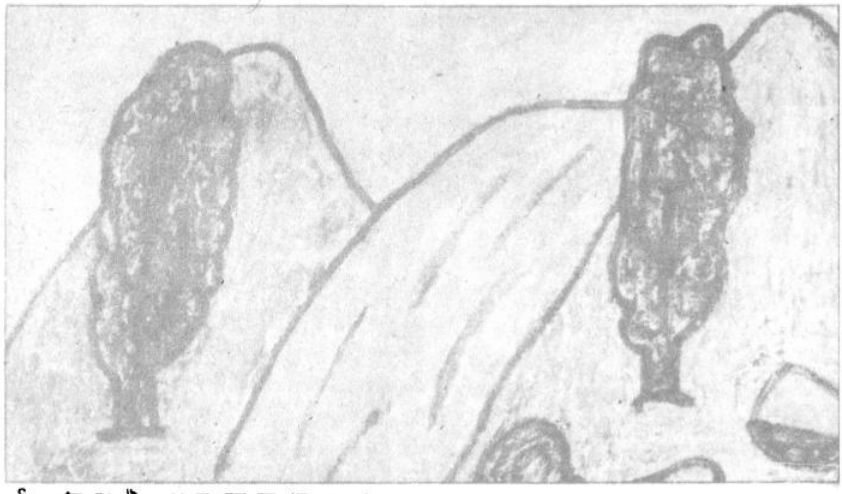

ছবি এঁকেছে **মৈনাক মজুমদার** (বয়স ৬)

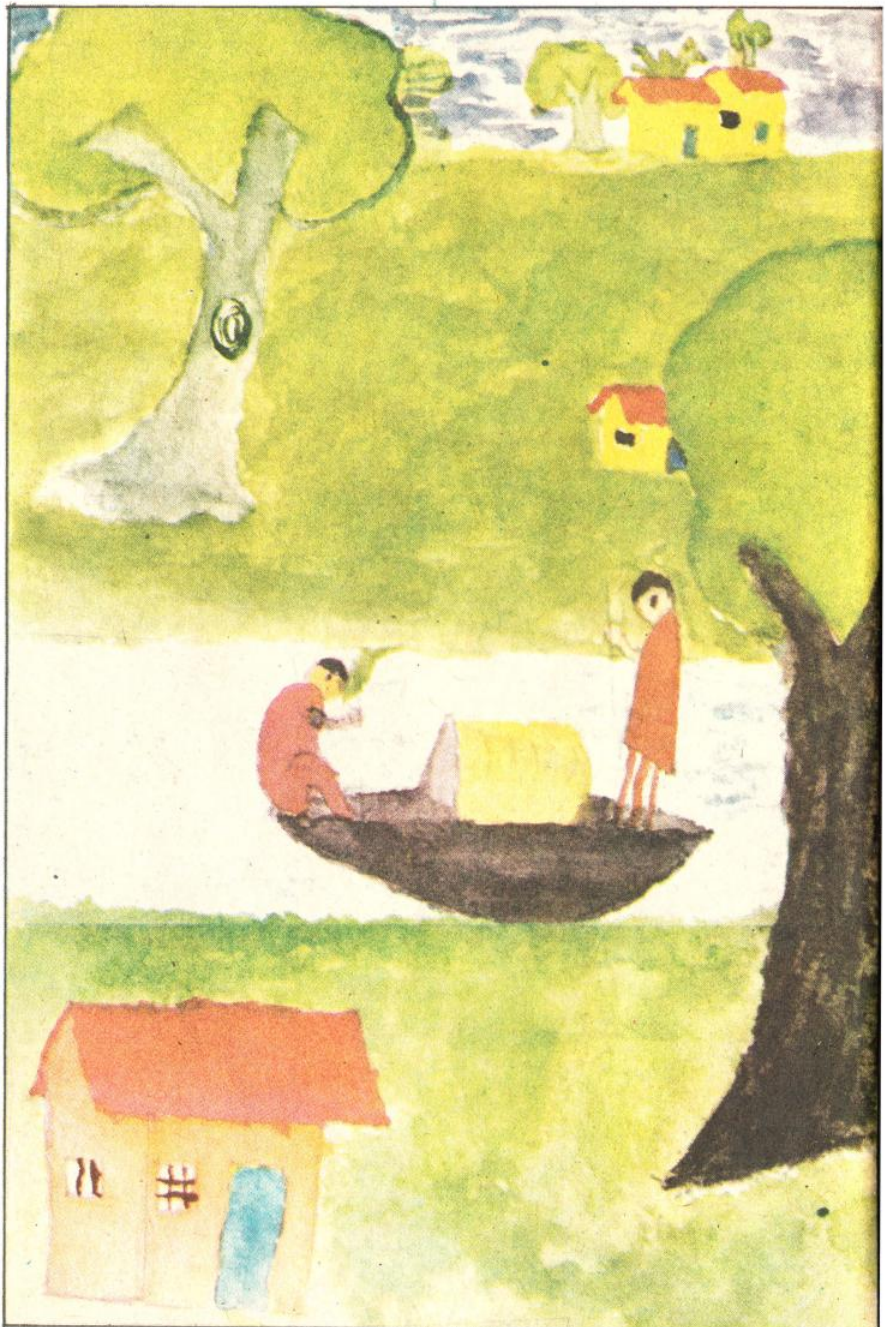

ছবি এঁকেছে **সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ৯)

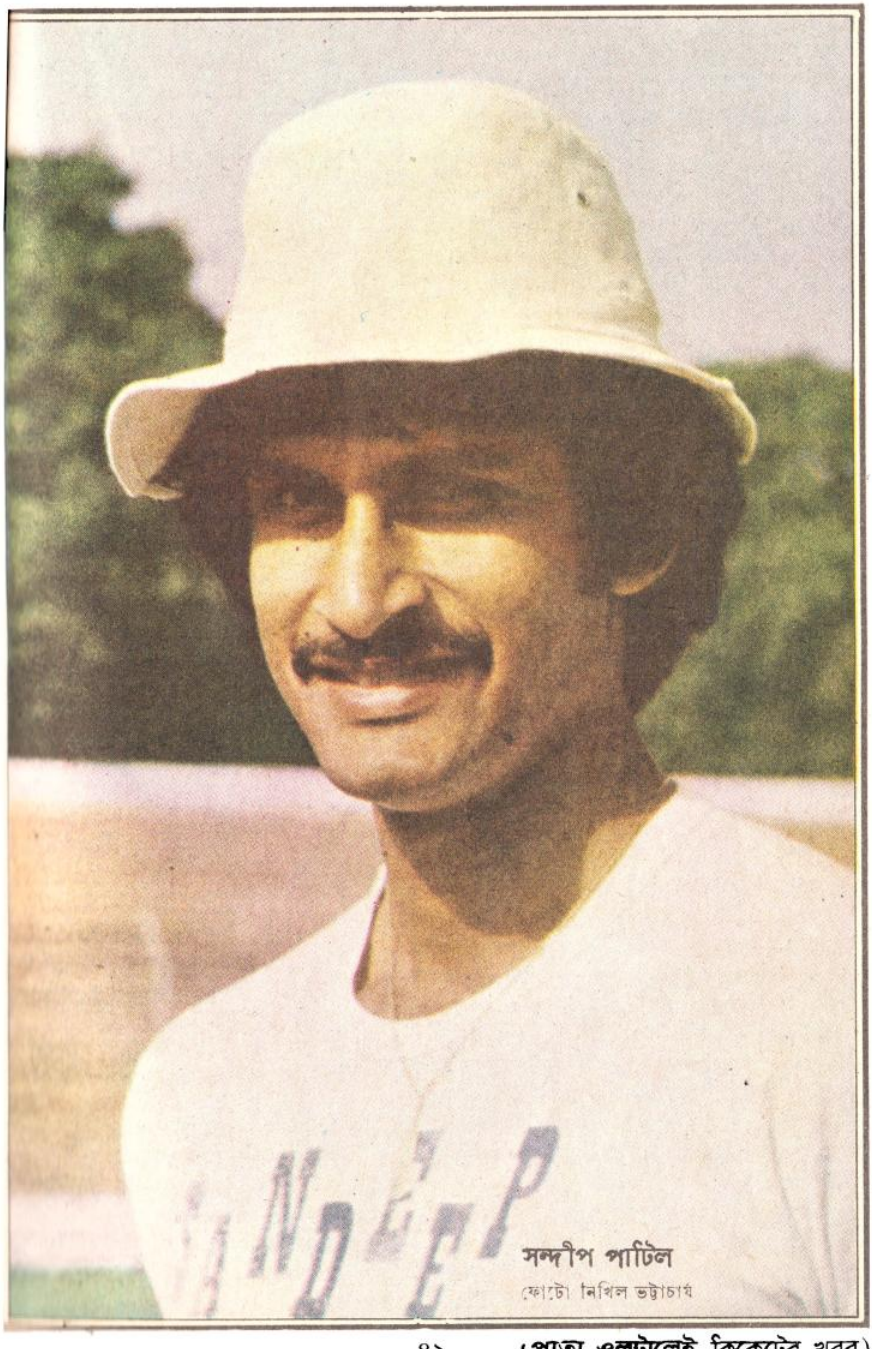

সন্দীপ পাটিল

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

এডিলেডে ড্র

আলোক ভট্টাচার্য

চরম উত্তেজনার মধ্যে এডিলেড টেস্ট শেষ পর্যন্ত ড্র হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন সুনীল গাভাসকার, আর হয়তো আফসোসে হাত কামড়েছেন গ্রেগ চ্যাপেল। শেষ দিনে ভারতকে অল-আউট করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক যদি তাঁর বোলারদের আর একটু বেশি সময় দিতে পারতেন, তবে নির্ঘাত এই টেস্টেও ভারত হারত —রাবারের ফয়সালার জন্য মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হত না।

আসলে চ্যাপেল ভাবতেই পারেননি, যে ভারত প্রথম ইনিংসে প্রায় সমানে সমানে যুঝেছে, সে-ই দ্বিতীয় ইনিংসে চরম ব্যর্থ হবে। পঞ্চম দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া ২৭৪ রানে এগিয়ে, হাতে ছয় উইকেট। তিনশো রানে এগিয়ে থেকে দান ছেড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু চ্যাপেল কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাননি। যখন রানে সাত উইকেটে (হিউজ ৫৩, চ্যাপেল ৫২) ডিক্লেয়ার করলেন, তখন জিততে হলে ২০৫ মিনিট এবং শেষ ঘন্টায় কুড়িটি বাধ্যতামূলক ওভারে ভারতকে করতে হবে ৩৩,১ রান—প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভারতীয় ব্যাটসমানদের একমাত্র লক্ষ্য তখন ম্যাচ ড্র করা।

মাত্র ১৩০ রানের মধ্যে গাভাসকার, চৌহান, বিশ্বনাথ এবং প্যাটেলের উইকেট হারিয়ে ভারত বিপদে পড়ে। বেংসরকারের (৩৭) লড়িয়ে ব্যাটিং, যশপাল এবং কিরমানির মরিয়া হয়ে উইকেট আঁকড়ে পড়ে থাকা এবং অষ্টম উইকেট জুড়িতে ঘাউড়ি এবং যাদব ঠান্ডা মাথায় প্রায় দশ ওভার খেলায় ভারত শেষ পর্যন্ত হার বাঁচায়।

টসে জিতেও এডিলেডের ব্যাটসমান-সহায়ক পিচে ভারত প্রথম ব্যাট করেনি। বিশ্বের যে-কোনো ক্রিকেট-মাঠের উইকেট প্রথম দিনের প্রথম দিকে পেস বোলারদের কিছু বাড়তি সাহায্য দিয়ে থাকে। গাভাসকার চাননি তাঁর ব্যাটসমানরা প্রথমেই লিলি, প্যাসকো, হগের মুখোমুখি হোক।

ব্যাটিং উইকেটকে কাজে লাগিয়ে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসমানরা ৫২৮ রানের একটা বড়সড় ইনিংস গড়ে তুলেছেন। ওপেনিং ব্যাটসমান গ্রাহাম উডের ১২৫ এবং অ্যালান বরডারের ৫৭ রান অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে মজবুত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করলেও হীরো ছিলেন সহ-অধিনায়ক কিম হিউজ। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতবার্ষিকী টেস্টে শতরান করার পর হিউজ তেমন সুবিধা করতে পারছিলেন না। অনেক কড়া সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু এডিলেডের ২১৩ রানের অনবদ্য ইনিংসটি সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। দুশো রান করেছেন মাত্র ২৯২ বলে। এর থেকে বুঝতে কষ্ট হয়না, প্রচন্ড আক্রমণাত্মক মেজাজে হিউজ ব্যাট করেছেন। কপিলদেবের মতো সীমারেকেও ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে এসে অনবরত ড্রাইভ করেছেন। যাদবকে ছয় মারতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ডীপ মিড-উইকেটে যশপালের হাতে ক্যাচ তুলে তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন—অবশ্য তার আগেই ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড তিনি কব্জা করে ফেলেছেন।

ভারতীয় ইনিংসের সূচনা মন্দ হয়নি। কিন্তু প্রথম উইকেটে সাতাত্তর রান যোগ হওয়ার পর অবিশ্বাস্যভাবে গাভাসকার আউট হয়ে যান। ভালই ব্যাট করছিলেন তিনি। হঠাৎ প্যাসকোর একটা অফ-কাটার বল তাঁর ব্যাটের ভিতরের দিকে লেগে, প্যাডের পিছন দিকে গুঁতো খেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে গিয়ে বেল ফেলে দেয়। গাভাসকারের একমাত্র সান্ত্বনা প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি টেস্টে ছয় হাজার রান পূর্ণ করেছেন।

অল্প রানের মধ্যেই যাদব, বেংসরকার এবং বিশ্বনাথ আউট হওয়ায় আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, ভারত হয়তো ফলো-অন করবে। আর ফলো-অন করলে ভারতের পক্ষে ম্যাচ বাঁচানো অসম্ভব ছিল।

কিন্তু এমন সময় অন্য মূর্তিতে দেখা দিলেন চেতন চৌহান এবং সন্দীপ পাটিল। দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ভারতকে

সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছে দিলেন এঁরা দুজন এবং যশপাল। চৌহানের দুর্ভাগ্য, মাত্র তিন রানের জন্য এবারেও তিনি শতরান পেলেন না। কিন্তু এডিলেডে তাঁর এই ইনিংসটি অমূল্য।

সিডনিতে সন্দীপ পাটিল মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। অনেকের আশঙ্কা ছিল, ঐ আঘাতের ভীতি কাটিয়ে উঠতে ওঁর সময় লাগবে। কিন্তু সন্দীপ পাটিল সাহসী ক্রিকেটার, অস্ট্রেলীয় পেস বোলারদের পরোয়া না করে যে আক্রমণাত্মক ইনিংসটি তিনি খেলেছেন—তা যে-কোনো ভারতীয়কে গর্বিত করবে। এডিলেডের একশো চুয়াত্তর তাঁর টেস্টে প্রথম সেনচুরি। আশা করা যায় সফরের বাকি খেলাগুলিতেও পাটিল এমনিভাবে সফল হবেন।

অনেকদিন পরে ভারতীয় স্পিনারদের কার্যকরী ভূমিকায় দেখা গেল। সতেরোটির মধ্যে দোশী এবং যাদব পেয়েছেন ছয়টি করে উইকেট এবং ওঁরা বল করেছেন বুদ্ধি খাটিয়ে, মাপা লেংথে। দোশী মাত্র পনরোটি টেস্টে তাঁর অর্ধশত উইকেট পূর্ণ করলেন।

মেলবোর্ন উইকেট সাধারণত স্পিনারদের কিছুটা সুবিধা দিয়ে থাকে। দেখা যাক তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় স্পিনাররা কতটা সফল হন। এই লেখা প্রকাশিত হবার আগেই অবশ্য তৃতীয় টেস্টের খবর তোমরা পেয়ে যাবে। সে-কথা থাক। এখন যেটা সবচেয়ে দরকার, তা হল ভারতীয় ব্যাটিংকে অন্তত কিছুটা মজবুত করা—এডিলেডের প্রথম ইনিংসে সাফল্য মাত্র দুই-তিনজন ব্যাটসমানের ব্যক্তিগত সাফল্য, দলগত সাফল্য নয়। গাভাসকার, বেংসরকার, বিশ্বনাথ প্রভৃতি স্পেশালিস্ট ব্যাটসমানরা রান করতে না পারলে ভারতের পক্ষে সিরিজ বাঁচানো অসম্ভব।

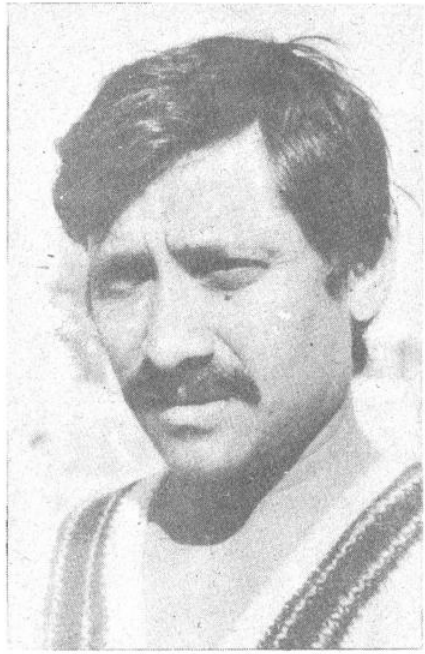

চেতন চৌহান

কিম হিউজ

ফটো: নিখিল ভট্টাচার্য

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপ ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল® - এস**

পরাস্ত প্রকাশ

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

মাঝে মাঝে এ-রকম হয়। আশঙ্কা যেখানে সবচেয়ে কম সেখান থেকেই বিপদ আসে। গত ৩০ জানুয়ারি বিজয়ওয়াড়ায় জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে সৈয়দ মোদির হাতে প্রকাশের ১০—১৫ ও ৯—১৫ হারের খবর পেয়ে বারবার এই কথাটাই মনে হচ্ছিল।

এ-কথা ঠিক, তার সাত দিন আগেই প্রকাশ জাপানি ওপেন-এর সিঙ্গলসে হেরেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার লুইস পঙ্গোর কাছে। ডাবলসেও (ফ্লেমিং ডেলফসকে পার্টনার নিয়ে) পঙ্গো-হাদিয়ান্তো জুটির বিরুদ্ধে। হাদিয়ান্তোর কাছেই প্রকাশ হেরেছিলেন—দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে। তারপর দ্বিতীয় মাস্টার্স প্রতিযোগিতার গ্রুপ ম্যাচে জোহানসনের সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কী, তেইশ মার্চ (১৯৮০) অল ইংল্যান্ড খেতাব জেতার পর প্রকাশ কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, স্বদেশীয় কেউ যে প্রকাশকে হারাতে পারবে না—এটা আমরা একরকম স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলাম।

না নিয়ে উপায় ছিল? একনাগাড়ে ন' বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন প্রকাশের ভারতে খেলাটা সময় নষ্ট মাত্র, এ-কথাও শোনা যেত। কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলতেন, সমপর্যায়ের কোনও খেলোয়াড় দেশে না থাকায় প্রকাশ ঠিকমতো প্র্যাকটিস পাচ্ছেন না, ফর্মের প্রকৃত বিকাশলাভের জন্যে প্রকাশের উচিত বিদেশ যাওয়া। প্রকাশ গিয়েছিলেনও—ডেনমার্কে।

তাই এ-যাবৎ প্রকাশের ছায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেন বিজয়ী সৈয়দ মোদি, পাথ গাঙ্গুলি, দেবিন্দর আহুজা প্রভৃতি। কিন্তু ৩০ জানুয়ারি সৈয়দ মোদির জয়ের পর সে-ছায়া সরতে শুরু করেছে বললে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

এর ব্যাখ্যা কী? তবে কি প্রকাশ সেই ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি—প্রকাশের ফর্ম

সৈয়দ মোদি (উঠতি তারকা)

"পড়ে গেছে"?

এই মুহূর্তে বলা শক্ত। তবে প্রকাশ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔজ্জ্বল্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়। অন্তত মোদির বিরুদ্ধে খেলার দিনে তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়া-শৈলী দেখাতে পারেননি। তাঁর দর্শনীয় ড্রপ শট, স্ম্যাশ, ব্যাকহ্যান্ড ফ্লিক সেদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

প্রকাশ নিজে কি ভাবছেন তাঁর ফর্ম সম্পর্কে? জাতীয় খেতাব হারাবার কিছুদিন আগে প্রকাশ প্রশ্নটি তুলেছিলেন—একটি প্রবন্ধে। প্রকাশ মনে করেন না তাঁর ফর্ম পড়ছে। লিখেছেন, অল ইংল্যান্ডের সময়ের ফর্ম (১৯৭৮) ফিরে পাবার জন্যে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও প্রকাশ লিখেছেন, চাপের মধ্যে তাঁকে খেলতে হচ্ছে বলে তিনি তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারছেন না, তিনি একটু রক্ষণাত্মকও হয়ে পড়েছেন। চাপের কারণ লোকের প্রত্যাশা—প্রকাশই সর্বত্র ফেভারিট, তাকে জিততেই হবে। বিগত অল-ইংল্যান্ড জেতার পর থেকেই এ-রকম প্রত্যাশা আকাশ-ছোঁয়া হয়ে যায়। এখন কেউ কেউ অন্য চিন্তা করতে পারেন। প্রকাশও।

তবে প্রকাশের হারের একটা অন্য দিকও আছে। প্রকাশের উপর্যুপরি জয় যাঁদের ঢেকে রেখেছিল, তাঁরা এবার আত্মপ্রকাশ করবেন একে একে। ধীরে ধীরে। সেটাও কি কম লাভ?

জাতীয় বক্সিং

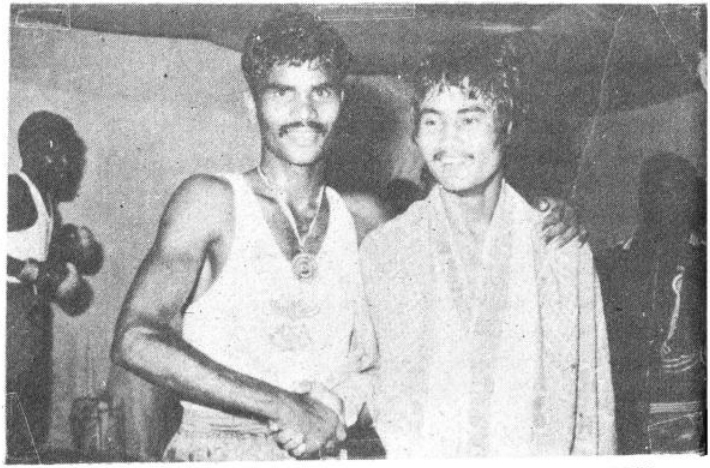

ফাইনাল রাউন্ডের পর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আমলাদাস ও রানার আপ দেবা তামাং

"বক্সিং ইজ অ্যান আর্ট অ্যান্ড আই অ্যাম অ্যান আর্টিস্ট।" রাম বিনে রামায়ণ আর আলি বিনে বক্সিং! ভাবাই যায় না। তাই আলির কথা দিয়েই শুরু করলাম। বক্সিং কী? এই প্রশ্নের এত সুন্দর উত্তর আর কেউ দেননি। কিন্তু আমেদাবাদে গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমের খানিকটা দূরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সপ্তত্রিংশ জাতীয় বক্সিংয়ে এগারোটি বিভাগেই জয়ী ফৌজি দলের লড়াই কিংবা বক্সিংয়ের কর্ণধারদের হালচাল দেখে তো মনে হয়, আলির বীজমন্ত্র এঁদের মনে আঁচড় কাটতে পারেনি।

ফৌজি দলে ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র আইজ্যাক আমলাদাস। দেশ-বিদেশের খ্যাতির নামাবলী গায়ে তেইশ বছরের শ্যামলা ছেলেটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাকাল করেছেন কেতাবি ঘুষির ঘায়ে। ফাইনালে বাংলার দেবা তামাং ওঁর সঙ্গে খানিকটা যুঝেছিলেন। জুনিয়র বক্সিংয়ে সোনা জিতে দেবা সিনিয়র-এ এসেছেন এবারই। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। পাথরভাঙা লেফট-এর সঙ্গে অব্যর্থ স্ট্রেট রাইট দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন বারবার। কিন্তু আমলা অনেক পরিণত। সুন্দর 'ডাক' করে ঘুষি কাটিয়ে নিয়েই দেবার পেটে, মুখে অজস্র কেউটের ছোবল মারেন চোখ ভোলানো 'লেফট হুক' দিয়ে। তাছাড়া চটুল 'ফুট ওয়ার্কে' আমলা ছিলেন ক্ষিপ্র, ছিল বুকভরা দমের পুঁজি। ওঁর 'অ্যাগ্রেসিভ' বক্সিংয়ের বড় সম্পদ। অভিজ্ঞতার ঝুড়ি থেকে তুলে আনা নিখুঁত ঘুষিগুলো সবার মন জয় করলেও আমলাকে কিন্তু 'বেস্ট বক্সার' করা হয়নি। ফৌজি এস মূর্তি হয়েছেন 'বেস্ট বক্সার'।

উনিশটি দলের মোট ১২৪ জন লড়েছিলেন এবার। সিভিলিয়ান ছেলেরা এগিয়ে আসছেন সন্দেহ নেই। বাংলার দেবা সম্বন্ধে ন্যাশনাল কোচ ওমপ্রকাশ বলেছেন, ওঁর ভবিষ্যৎ আছে। তবে অধ্যবসায় চাই। ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়াতে হবে। ঘুষি খেয়ে থমকে যাওয়ার অভ্যাস বদলাতে হবে। দশ কিলোগ্রাম ওজনের পাঞ্চিং ব্যাগে স্টেপিং মিলিয়ে প্র্যাকটিস করলে ওঁর স্পীড বাড়বে। রিংয়ে হবে শানানো হাতিয়ার।

আর এক ফৌজি জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন জেভিয়ার এবার সিনিয়রেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মহারাষ্ট্রের চ্যবন, রেলের ভইসা-গিড়ার মতো বাঘা-বাঘা বক্সারদের হারিয়ে।

ওমপ্রকাশ, সিদ্দিকি, সাইনির মতো বেশ কয়েকজন ভাল বক্সার নিয়ে রেল হয়েছে রানার্স আপ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা শক্ত, সুঠাম বক্সার দিয়ে রিং ভরিয়ে দিচ্ছে। এই শক্তি আর সাহসের সঙ্গে চাই তৎপরতা।

অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বিহার সামগ্রিকভাবে এগোচ্ছে। তবে সাইন্টিফিক বক্সিংয়ে বাংলার ঘরানা এখনও সেরা।

বক্সিংয়ের অর্জুন বি এস থাপা এবার আসেননি। সিভিলিয়ানদের মধ্যেও নামী কয়েকজন বাদ পড়েছেন। নতুন মুখ আশার আলো দেখাতে পারে। সবার আগে দরকার প্রশিক্ষণ। ভাল কোচ সরঞ্জাম আর ভবিষ্যতের ভরসা। রেলের কোচ বক্সিংয়ের কিংবদন্তী বাডি ডি'সুজা দুঃখ করে বলেছেন, "ওঁদের সঙ্গে রিংয়ে পাল্লা দিতে হলে প্রশিক্ষণেও পাল্লা দিতে হবে।" প্রশিক্ষণের ব্যাপক পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত কোনো রাজ্যের নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গ বক্সিং লীগ এ-বছরের শুরুতেই ন্যাশনাল কোচের পরিচালনায় এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় কাজে নেমেছে।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। **প্রকাশস্থান** ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

২। **প্রকাশকাল** পাক্ষিক

৩। **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** বাপাদিত্য রায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৪। **সম্পাদক** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

৫। **যে-সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার - গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :**

(ক) মালিক আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অরিত্রকুমার সরকারের পক্ষে অরূপকুমার সরকার। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

আমি বাপাদিত্য রায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে সত্য।

বাপাদিত্য রায়

১ মারচ ১৯৮১

প্রকাশক

জাদুর দেশে জগন্নাথ

ফোটো সুবীর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সদনে কিছুদিন আগেই আবার মঞ্চস্থ হল শৈলেন ঘোষের 'জাদুর দেশে জগন্নাথ'। ছোটরা সব্বাই যে কী সুন্দর অভিনয় করেছিল সেদিন! তোমরা অনেকেই হয়তো 'শিশু রঙ্গন'-এর এই নাটকটি দেখেছ। যারা দেখোনি, সুযোগ পেলেই দেখে নিও।

ফোটো নিমাই ঘোষ

হ য ব র ল

এমন অবিশ্বাস্য মজার দেশ যে, একবার গেলেই দু-বার যেতে হয়। তোমরা যারা এখনো 'হ য ব র ল'র দেশ দেখবার সুযোগ পাওনি, একটু খেয়াল রেখো—এই কলকাতার মধ্যেই কোথাও না কোথাও দেখতে পেয়ে যাবে। সত্যি বলছি, শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকে লাল রুমাল চোখের সামনে বেড়াল হয়ে গেল! আর চিরকেলে ন্যাকা নেড়ার গানও শুনতে পাবে মনপ্রাণ ভরে।

স্বাস্থ্য ঝলমল, প্রাণে খুশী উচ্ছল!
বোর্নভিটা খান... জীবনটা হাসিখুশিতে ভরিয়ে দিন।
মজাদার বোর্নভিটা আপনার পরিবারকেও দিন।
স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির
গুণে ভরপুর। এর নির্মাতা ক্যাডবেরি— গত ১০০ বছর
ধরে পানীয় আহার তৈরীতে যারা সিদ্ধহস্ত।
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর!
Cadbury's
Bournvita
The tastier food drink
আরও পাওয়া যায় কম-খরচের রিফিল প্যাকে!
OBM/5532 BN

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা অজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। কিন্তু সেটা কী? পুরনো হাতব্যাগে পাওয়া এই আঙটিটা। বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে একটা লোক কিছুদিন শিশিরদের বাড়িতে কাজ করেছিল। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর—

॥ ৮ ॥

কয়েকটা দিন বেশ কাটল।

শিশির সন্ধের দিকে ভালই থাকছিল। মাথার যন্ত্রণা নেই, ঘাড়-পিঠ ব্যথাও করছে না, এমন কিছু দেখছে না যাতে ভয় পাবে। বেশ সুস্থ। খানিকটা ঝোঁক করেই একদিন সিনেমা দেখে এল একলা-একলা। কই, কিছুই তো হল না। তার মানে শিশির ভাল হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে মাঠেও গিয়েছিল দিন দুই। একাই। বাবু দুর্গাপুর ফিরে গিয়েছে। অবশ্য গাড়ি করেই গিয়েছিল মাঠে তুলসীদার সঙ্গে। তবে শিশির তুলসীদাকে কাছাকাছি রাখেনি। আগের মতন এক জায়গায় চুপ করে বসেও সময় কাটায়নি শিশির। খানিকটা ঘোরাফেরাও করেছে। নজর রেখেছে সেই অদ্ভুত লোকটাকে যদি আবার দেখতে পায়। পায়নি। লোকটাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

এখন তা হলে কী করা যায়?

আঙটিটা কি আবার আলমারি থেকে বের করে পরে দেখবে? যদি যাচাই করতে হয়, আঙটিটা পরার দরুনই এমন কান্ড ঘটল কি না, তবে ওটা আবার পরে দেখতে হয়। কে এস তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, আবার একবার পরে এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার।

শিশির ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। একটানা এতদিন ভোগার পর নতুন করে ঝুঁকি নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। আবার ব্যাপারটাকে ধামা-চাপা দিতেও তার ভাল লাগছিল না একেবারে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী?

কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে আবার দেখা করল শিশির। দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর শিশির বলল, "আমি ভাবছি, আঙটিটা যেমন আছে তেমনই থাক এখন। তার আগে একবার হাজারিবাগে পিসিমার কাছে যাই।"

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "গিয়ে কী করবে?"

"খোঁজখবর করি।"

"কিসের খোঁজ করবে? আঙটির?"

শিশির মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

কৃষ্ণদয়াল সামান্য ভাবলেন। বললেন, "আঙটির ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পারলে ভালই। কিন্তু পারবে কি? তোমার পিসিমাও তো কিছু জানেন না শুনেছি। তোমরাই বলেছ।"

শিশির চুপ করে থাকল। কথাটা ঠিকই। আঙটিটার ইতিহাস যা শোনা গিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু শোনার আশা করা যায় না। তবু... অনেক সময় সব কথা মানুষের মনে থাকে না, বলতেও ভুলে যায়। পিসিমার কাছ থেকে শিশির যখন আঙটিটা নেয়, তখন পিসিমাও ওই আঙটি নিয়ে মাথা ঘামায়নি, শিশিরও নয়। এখন হয়তো পিসি মাথা ঘামাবে।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমার তো মনে হয়, আঙটিটা আবার তোমার পরা দরকার। পরীক্ষা করে দ্যাখো, সত্যিই ওই আঙটির কোনো ক্ষমতা আছে কি না?"

শিশির দ্বিধার গলায় বলল, "আবার যদি আগের মতন হয়?"

"হতে পারে," কৃষ্ণদয়াল ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "আবার নাও পারে।"

শিশির কৃষ্ণদয়ালকে লক্ষ করছিল। বলল, "যদি হয়?"

"হলে খুলে রাখবে।" কৃষ্ণদয়াল নতুন করে সিগারেট ধরালেন। এটা তো ঠিকই

শিশির, আঙটিটা আর যাই করুক তোমায় প্রাণে মারবে না। যদি মারার হত, আগেই মারত। তাছাড়া, তুমি জানতে না বলে অত ভুগেছ, আঙটিটা তোমার হাতে ছিল বরাবর। এখন তুমি সবই জানো, বেগতিক দেখলেই খুলে ফেলবে।"

শিশির মাথা নাড়ল। কথাটা ঠিকই।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শিশির বলল, "সেই লোকটাকেও আর মাঠে দেখতে পাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ, লোকটাও অদ্ভুত।"

"একবার যদি দেখতে পেতাম—"

"পেলে ভাল হত। না পেলে আর কী করবে! আমি বরং বলি, তুমি যা করবে একটা একটা করে করো। প্রথমে আঙটিটা পরো। দিন তিন-চার দেখো। যদি দেখো কিছুই হল না, আঙটিটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো।"

"তা না হয় দিলাম কেষ্টদা, কিন্তু আমার অসুখ?"

"ওটা তোমার ভুলে যেতে হবে। সব অসুখের কারণ খোঁজা বৃথা। বড়-বড় ডাক্তারও অনেক অসুখের কারণ বলতে পারেন না।"

শিশির চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "বেশ, আপনি যা বলছেন তাই করি।"

শিশির উঠতেই যাচ্ছিল, কৃষ্ণদয়াল বললেন, "ভাল কথা, আঙটিটা আমি একজনকে দেখাতে চাই। কী লেখা আছে দেখাব। যদি পড়তে পারে।"

"কাকে দেখাবেন?"

"গুপ্তসাহেব বলে এক ভদ্রলোককে। তাঁর কিছু চর্চা রয়েছে। পুরনো কয়েন—মানে ওই পয়সা টাকা এই সব জমান। বলে রেখেছি।"

"বেশ, দেখাবেন। আগে তাঁকে দেখাবেন, না আগে আমি পরব?"

"তুমি আগে পরে নাও, পরে আমি দেখাব।"

শিশির উঠে পড়ল।

এগিয়ে দিতে এসে কৃষ্ণদয়াল বললেন, "কবে পরবে?"

"কাল, না হয় পরশু।"

"পরশু পোরো। তবে একটা কথা বলে দিই। আঙটিটা পরার পর বাইরে কোথাও বেরিও না কদিন!"

"কেন?"

"সাবধানের মার নেই। বাড়িতেই থেকো। আমি তোমার খোঁজ নিতে যাব রোজই সন্ধে-বেলা, কেমন?" ঘাবড়াবার কিছু নেই। যদি তোমাকে হাজারিবাগ যেতেই হয়, যাবে। দরকার পড়লে আমিও যাব।"

শিশির আর কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই শিশির পেছনে পায়ের শব্দ পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তুলসী।

"কী তুলসীদা?"

"পরাগের খবর পেয়েছি।"

"পেয়েছ! কই?" শিশির এমনভাবে তাকাল যেন তুলসীর পেছনেই প্রয়াগ দাঁড়িয়ে আছে।

তুলসী বলল, "পরাগ কাশীপুরেই আছে। হাতিবাগানে ও এসেছিল কাল। দেখা করে ফিরে গিয়েছে।"

"কোথায় আছে, কাশীপুরে?"

"রেল ব্রিজের কাছে। জায়গাটার নাম বলতে পারল না। গুদোম আছে। পরপর।"

শিশির কিছু ভাবল। তারপর বলল, "জায়গার নাম না জানলে ওকে তুমি খুঁজে পাবে কেমন করে?"

তুলসী বলল, "মহল্লা জানতে পেরেছি যখন, খুঁজে খুঁজে বার করে নেব।"

"বেশ। তবে একবার ওকে ধরে আনো। বাবার নাম করে বলো, বাবু এবার দেখা করতে বলেছেন।"

তুলসী মাথা নাড়ল।

শিশির নিজের ঘরে এসে বাতি জ্বালাল। পাখা চালিয়ে দিল। গরমটা কমে এসেছে, তবু এক-একদিন কেমন গুমোট হয়ে থাকে। আজ সেইরকম গুমোট। আবার কি বৃষ্টি হবে? হতেই পারে। বর্ষার দিন।

বিছানায় বসল শিশির। আবার তাকে আঙটিটা পরতে হবে তা হলে? যুক্তির দিক থেকে কে-এস ঠিকই বলেছেন, যাচাই না করে কোনো কিছুকেই সত্যি বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। ওই আঙটির কোনো অদ্ভুত গুণ থাকতে পারে, আবার নাও পারে। যদি থাকে, তবে শিশির আঙটি পরলে নতুন করে

কোনো-কোনো উপসর্গ দেখতে পাবে। যদি আগের মতন কিছু না হয়, তবে বুঝতে হবে আঙটিটা নির্দোষ।

ধরে নেওয়া যাক আঙটিটা কিছুই নয়। মামুলি। যদি তাই হয় তবে আঙটি খুলে রাখার পর শিশির ভাল থাকছে কেন? কেনই বা সেই মাঠের লোকটা তার কাছে এসেছিল?

হাজার ভেবেও শিশির এ-সব 'কেন'র জবাব খুঁজে পায়নি এ ক'দিন। আজও পাবে না। কাজে-কাজেই কে-এস যা বলেছেন, একটা-একটা করে ব্যাপার বেছে নিয়ে দেখা যাক কোনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেটাই ঠিক কথা।

শিশির অন্যমনস্কভাবে আলমারির দিকে তাকাল। আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখাও যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত দেখল শিশির নিজেকে, তারপর উঠল।

আঙটিটা একবার দেখা যাক। আজ ক'দিন শিশির আঙটিটা ছোঁয়নি।

চাবি খুঁজে নিয়ে আলমারি খুলল শিশির।

শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি—আরও কত কী, অগোছালো করে রাখা। তারই একপাশে শিশির আঙটি রেখেছিল।

প্রথমটায় আঙটি খুঁজে পেল না শিশির। বুক ধক করে উঠল। চুরি হয়ে গেল নাকি?

ব্যস্তভাবে কিছু প্যান্ট-জামা মাটিতে ফেলে ভাল করে হাতড়াতেই আঙটিটা পাওয়া গেল।

হাতে নিয়ে দেখল শিশির।

নীচে কুকুরটা চেঁচাচ্ছে। বাবার হুকুমে বেচারি এখনও নীচে বাঁধা থাকে। শিশিরকে দেখতে পেলে এমন ছটফট করে কাঁদে যে, মায়া হয় শিশিরের। ওকে আবার ওপরে নিয়ে আসতে হবে।

"দাদা?"

শিশির দরজার দিকে তাকাল। তুলসীদা।

তুলসী বলল, "কর্তাবাবু তোমায় একবার ডাকছেন।"

"যাচ্ছি।"

তুলসী চলে গেল।

আঙটি রেখে, মাটির ওপর পড়ে থাকা প্যান্ট-শার্ট কোনোরকমে আলমারিতে গুঁজে শিশির বাইরে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে, দেখল বাবা নিজেই ওপরে আসছেন।

অমৃতবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছেলেকে দেখছিলেন।

শিশির সামনে আসতেই অমৃতবাবু একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। টেলিগ্রাম।

"বুড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। কী অ্যাকসিডেন্ট লেখেনি। বোধহয় সিরিয়াস। তোমায় একবার যেতে লিখেছে।" অমৃতবাবু উদ্বেগের গলায় বললেন।

পিসিমার অ্যাকসিডেন্ট? শিশির টেলিগ্রামটা পড়তে লাগল। পিসেমশাই টেলিগ্রাম করেছেন।

শিশির বলল, "আমি কালই যাব?"

"যাও। হঠাৎ বুড়ির কী হল বুঝতে পারছি না।"

শিশিরও বুঝতে পারছিল না, পিসিমার অ্যাকসিডেন্ট আঙটির জন্যে কি না। (ক্রমশ)

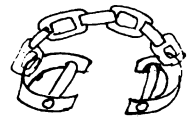

হুডিনি লন্ডনে গিয়ে সবচাইতে নামী মিউজিক হল-এর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "আপনার হল-এ আমার জাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন।" ম্যানেজার হুডিনিকে বলল, "আপনি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ওদের হাতকড়া খুলে বেরিয়ে আসতে পারেন, তা হলে ভেবে দেখব।" হুডিনি গেলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, একজন ডিটেকটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে রাজি করালেন হাতকড়া পরাতে। একটা থামের সঙ্গে হুডিনিকে আটকে ডিটেকটিভ মাথায় টুপি চাপিয়ে বলল, "আপনি থাকুন, আমি লাঞ্চ সেরে আসি।" হুডিনি পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, আমারও লাঞ্চ করা হয়নি।" বলে এগিয়ে এসে খোলা হাতকড়াটা ডিটেকটিভের হাতে দিয়ে তার হাত ধরে বাইরে এলেন।

ছোটদের যত সেরা বই

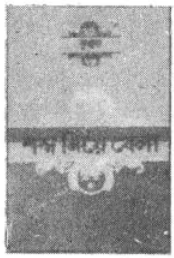

কুন্তক-এর 'শব্দ নিয়ে খেলা' এমন একটি বই যা শুধু একবার পড়েই ফুরিয়ে ফেলা যায় না। বারবার পড়তে হয় মাঝেমাঝেই করতে হয় নাড়াচাড়া। হাতের নাগালে না পেলে মনে হয় দামী জিনিস হয়ে গেছে হাতছাড়া। কেন বলো তো? যারা পড়েছ, তারা তো জানোই. যারা জানো না, তাদের জন্য বলছি, এই বইতে কুন্তক একেবারে গল্পের মতো করে শিখিয়েছেন বাংলা বানানের অনেক মজাদার ব্যাপার স্যাপার যা জানলে একদম ভুল হবে না বানান। শুধু ছোটরা নয়, বড়োরাও আগ্রহ বোধ করবেন এ-বই পড়তে। সহজে বানান শেখার এমন বই বাংলা ভাষায় আগে বেরোয়নি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নতুন লেখক কিন্তু শুরুতেই তিনি শাদা ঘোড়ার দিগ্বিজয়ী সওয়ার হয়ে শিশুমনের একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন। দুটি কাহিনীর একত্র-সংকলন 'শাদা ঘোড়া' এক দাম্ভিক রাজার জেদ আর অবিচারের উঁচু মাথা কী করে নুয়ে পড়ল এক সামান্য রাখালের স্বপ্ন ও সংকল্পের কাছে তাই নিয়ে 'শাদা ঘোড়া'। আরেকটি কাহিনী ঋষিকুমার'ও একইরকম সুন্দর ছোটদের স্বপ্নের কথা, কল্পনার কথা, আনন্দ আর দুঃখের কথা এই বইতে যেভাবে বলা হয়েছে সহজে তার তুলনা মেলে না। পাতায় পাতায় পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি বাড়তি আকর্ষণ।

শিশিরকুমার মজুমদারের তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিডুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপপো ১২ আরো এক ডজন ১২ ফটিকচাঁদ ৮ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ মাধুরীলতার গল্প ৬ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কুষ্টাল ১০ **অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের** সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮ **সুভাষচন্দ্র বসুর** তরুণের স্বপ্ন ১০ **সাগরময় ঘোষের** একটি পেরেকের কাহিনী ৪ **মুকুল দত্তের** টেবিল টেনিসের আইনকানুন ৪ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** বিবেকানন্দ চরিত ১৫ **প্রফুল্লকুমার সরকার** শ্রীগৌরাঙ্গ ৭ **সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের** মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬ **ডঃ শিশির-কুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহর** NETAJI—A Pictorial Biography 50 **শেখর বসুর** সোনার বিস্কুট ৮ **নলিনী দাসের** মধ্যরাতের ঘোড় সওয়ার ৫ **শিবরাম চক্রবর্তীর** লাভের বেলায় ঘণ্টা ৮ **সুনির্মল বসুর** ছন্দের টুং টাং ৮ **সুজিতকুমার সেন-গুপ্তর** রহস্যময় সেই রিভলবার ৬ **কার্তিক ঘোষের** চিড়িয়াখানার দেশে ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

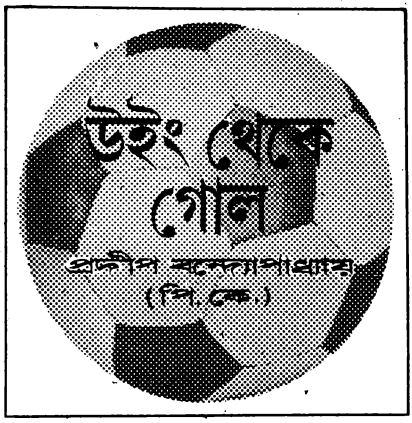

॥ ১৫ ॥

ঢাকায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে খেলতে যাবার আগে শুধু জীবনে প্রথম ভারতবর্ষের খেলার কথা নয়, ঢাকার কথাও আমার বারবার মনে আসছিল। পূর্ব বাংলা সম্পর্কে কত গল্পই তো ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। এবার শোনার সঙ্গে দেখার মিলিয়ে নেওয়ার পালা।

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল। হোটেলে যাবার পথের দুপাশে তাকিয়ে মনে হল, নিজের দেশেই আছি।

আমরা উঠলাম বিখ্যাত শাহবাগ হোটেলে। সব-কিছু ঝকঝকে তকতকে। বিরাট-বিরাট সোফা, বেল টিপলেই হোটেল-বয়, বাথরুমে ঠান্ডাজল-গরমজল, মেঝেয় দামি কার্পেট—এসব তো আগে দেখিনি।

তিন দিন পরে আমাদের প্রথম খেলা সিংহলের (এখনকার শ্রীলঙ্কা) সঙ্গে। বিরাট নতুন স্টেডিয়াম। কিন্তু মাঠ মোটেই সবুজ নয়। নরম সবুজ মাঠ না হওয়ায় আমরা কিছুটা হতাশ হলাম। তার ওপর, ঐ মাঠে প্র্যাকটিস করারও অনুমতি পাওয়া গেল না। আমরা প্র্যাকটিস করলাম ঢাকা উয়াড়ি ক্লাবের চমৎকার সবুজ ঘাসে-মোড়া মাঠে। অনেকেই বাঘাদার খবর জানতে চাইলেন। বুঝলাম, ঢাকার মাঠে অন্তত কিছু সমর্থক আমরা পাব।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান বর্মাকে ৩—১ গোলে হারিয়েছিল। কাইয়ুম হ্যাটট্রিক করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহল। লীগ-পদ্ধতিতে খেলা। সুতরাং, এই ম্যাচ ড্র হলে পাকিস্তানের সুবিধা। আগের বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। মাসুদ ফকরি একটি গোল শোধ করলেও, পাকিস্তানকে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল ৩—১ গোলে। এবার দেশের মাটিতে হারের জবাব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য পাকিস্তান টীম ভালরকম প্রস্তুতি নিয়েছিল।

খেলার দিন সকাল দশটা থেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকে শাহবাগ হোটেলে এলেন। কিন্তু ম্যানেজার সরোজ বসু কাউকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিলেন না। সবাই যাতে বিকেলের ম্যাচের দিকে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

সিংহলের সঙ্গে খেলাটির বর্ণনা এই রচনার শুরুতেই দিয়েছি, ভুলে যাওনি আশা করি। খেলার ফলাফল যখন ৩—৩, আহত হয়ে মাঠের বাইরে শুয়ে ছটফট করছিলাম। ক্যাপ্টেন আজিজের কথায় কোনোরকমে উঠে মাঠে নেমে পড়েছিলাম। পরেন বাহাদুরের পাস থেকে আমি জয়সূচক গোলটি করার সঙ্গে-সঙ্গেই খেলা শেষ। সিনিয়র ফুটবলারদের কাঁধে চেপেই মাঠ থেকে বেরোলাম। আমাকে প্রায় জোর করেই খেলিয়েছিলেন আজিজ। প্রচন্ড আবেগে, অনেকক্ষণ তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন, কিছু বলতে পারলেন না।

এই ম্যাচ থেকেই বেশ কয়েক বছরের জন্য পাকাপাকিভাবে ভারতীয় দলে এসে গেলাম। তোমাদের হয়তো মনে আছে, সিংহলের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি আমি কীভাবে করেছিলাম। মেওয়ালাল ভলি নিলেন, নীচের দিকে পা লাগায় বল ব্যাকস্পিন করে পিছনে উঠল। অনেক দূর থেকে ছুটে এসে, বল নামার মুখে ভলি নিয়ে আমি গোল করলাম। যে মেওয়াদা একশোর মধ্যে নিরানব্বুইবার নিখুঁত ভলি নিতেন, তাঁর একটি মিসকিক থেকেই আমি আমার প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল গোল' পেলাম। এই ম্যাচে আমার শুরু, মেওয়াদার শেষ। মেওয়াদা আর কখনো ভারতের জার্সি পরেননি।

মাঠ থেকে খুশি মনে হোটেলে ফিরলেও

কোমরের ব্যথাটা আবার কষ্ট দিচ্ছিল। তখনও জার্সি-প্যান্ট ছাড়িনি। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বিলিতি কায়দাকানুন সবে শিখছি। বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, 'কাম ইন'।

তিন-চারজন হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকলেন। মনে হল, কিছু ফুল ঘরের মধ্যে ঝরে পড়ল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ পোলাডা কই?" ওঁদের মধ্যে একজনের পরনে নিখুঁত বিলিতি পোশাক। সামান্য ঝুঁকে বললেন, "আই অ্যাম শাজাহান।" পাশের মোটাসোটা হাসিখুশি ভদ্রলোক বললেন, মিঃ শাজাহান রেডিও পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কলকাতায় ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। ঐ হাসিখুশি ভদ্রলোক হলেন নাসিম চাচা। তিনি কলকাতায় দীর্ঘদিন খেলেছেন। কিন্তু ছ' ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ঐ বৃদ্ধ লোকটি কে? হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বলে উঠলেন, "লজ্জা করে না? ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল খেলতে গেছ, দাড়ি কামাওনি!" অপ্রত্যাশিত বকুনিতে কিছুটা গুটিয়ে গেলাম। নাসিম চাচা বললেন, "আরে থামো বড়দা, বাচ্চা ছেলেটাকে এত বকছ কেন?" এবং তারপর, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক মিঃ শাজাহান নাটকীয় ভঙ্গিতে বৃদ্ধ লোকটির পরিচয় দিলেন, "নাম শুনে থাকবে, ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা ফরোয়ার্ড—সামাদ।"

সামাদ! আমি কি ঠিক শুনছি! আমার স্বপ্নের মানুষ এসেছেন আমারই কাছে, ক'জনের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে? সামাদ সাহেবের পায়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম।

দেশ-বিভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কত গল্প শুনেছি। না দেখলেও, মনে মনে তাঁকে দেখেছি। সেই সামাদ সাহেব আমার সামনে বসে কথা বলছেন। বললেন, "তুমি জামশেদপুরের ছেলে? আরে আমিও তো বিহারের (পূর্ণিয়া) লোক। তোমাকে এমন খেলা কে শেখাল?" জবাব দেব কী, আমি তখন শুধু আমার স্বপ্নের ফুটবলারকে দেখছি।

কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে আমি বললাম, "আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে।" সামাদ সাহেব বললেন, "নিশ্চয় জানবে। আমি রোজ তোমার কাছে আসব।"

সত্যিই, তার পর থেকে রোজই এসেছেন।

খুব ছেলেবেলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে বল তৈরি করে আর সিগ্রেটের টিন দিয়ে খেলতেন। স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! বছর দশেক যখন বয়স, একটা পুরনো টেনিস বল হাতে...মানে পায়ে পেয়ে গেলেন। কিন্তু পড়াশুনো প্রায় ডকে উঠল। খেপে গিয়ে সামাদের বাবা একদিন দোতলা থেকে ছেলেকে প্রায় ছুঁড়েই ফেলে দিলেন। সৌভাগ্য তাঁর, এবং ভারতীয় ফুটবলের, সামাদ পড়লেন একটা দাঁড়ির খাটিয়ার ওপর। ভবিষ্যতের ফুটবল জাদুকর ভাবলেন, "ফুটবল তো খেলতে হবেই—তবে তখন থেকে সেটা ঘটাতে হবে বাবাকে লুকিয়ে!'

ঢাকায় একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "শুনেছি আপনি ইচ্ছা করলেই গোল করতে পারতেন। সত্যি?" নির্মল হাসিতে সামাদ সাহেবের মুখ ঝলমল করে উঠল, "দূর, এসব বাজে কথা। তাই কখনো কেউ পারে নাকি? তবে হ্যাঁ, কোনো-কোনোদিন মাঠে নেমে মনে হত, গোল করবই। আজেবাজে আওয়াজ শুনলেও রোখ চেপে যেত।'

"আপনি নিজে কেন বেশি গোল করতেন না?"

"ছেলেবেলায় আমি নিজে প্রচুর গোল করতাম। একটু বড় হয়ে বুঝলাম, নিজে গোল করলে, দশটা সুযোগ থেকে বড় জোর তিনটে গোল হতে পারে। কিন্তু ডিফেন্ডারদের নিজের দিকে টেনে নিয়ে ফাঁকায় দাঁড়ানো অন্য ফরোয়ার্ডদের বল দিলে দশটা সুযোগ থেকে পাঁচ-ছটা গোল হতে পারে।"

একদিন দুঃখ করে বললেন, "জানো, আমার কোনো আই এফ এ শীল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ মেডেল নেই।" এত বড় ফুটবলার হয়ে কোনো বড় টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন টীমে থাকার সুযোগ সামাদ সাহেবের হয়নি। খেলার দিক থেকে সামাদ সাহেবের সঙ্গে নিজের তুলনা অবশ্যই করছি না। কিন্তু এক দিক দিয়ে প্রচন্ড মিল, আমিও কখনো আই এফ এ শীল্ড বা অন্য কোনো সর্বভারতীয় ট্রফির চ্যাম্পিয়নশিপ মেডেল পাইনি! (ক্রমশ)

মাঠের রাজা

মানবেন্দ্র পাল

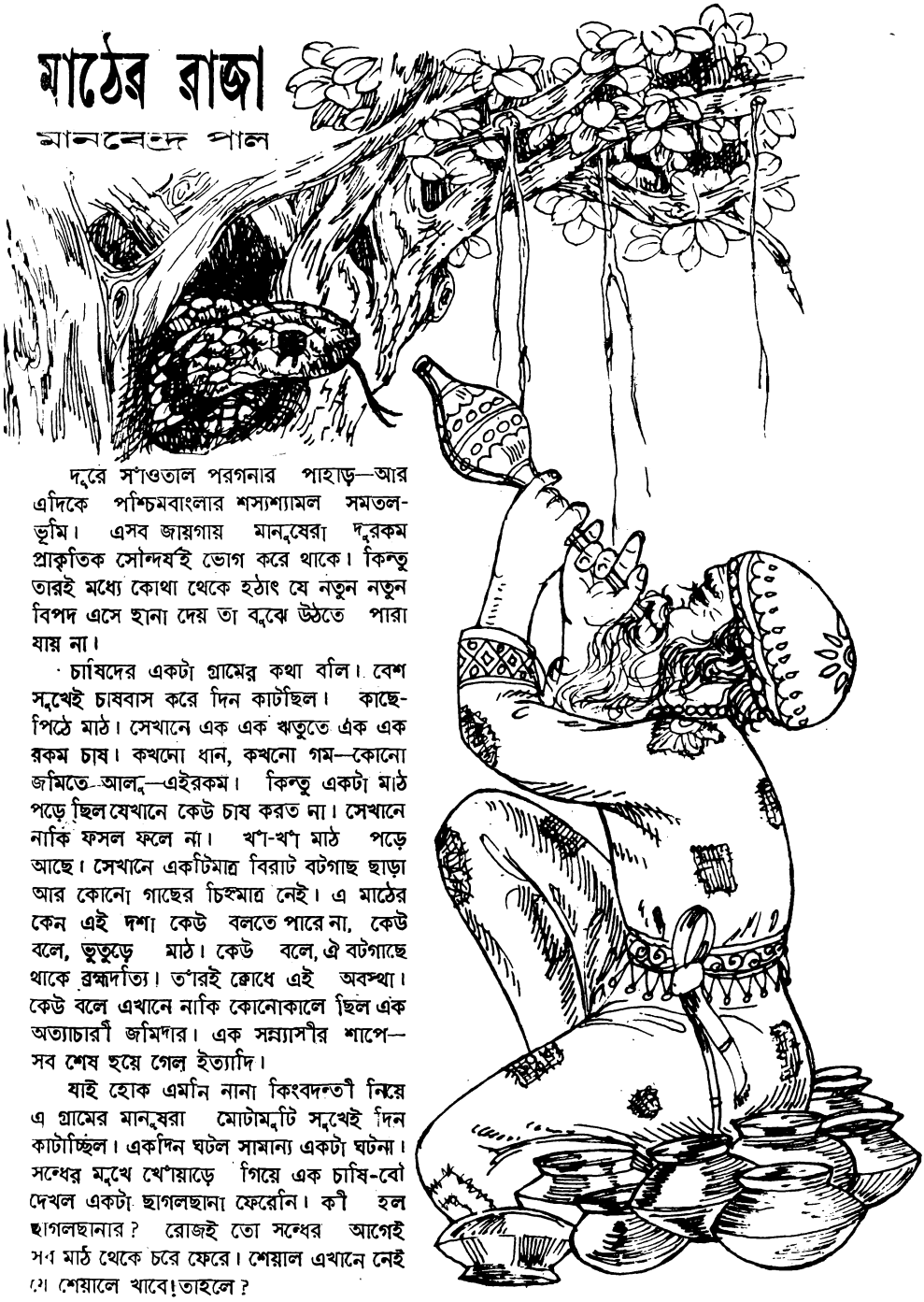

দূরে সাঁওতাল পরগনার পাহাড়—আর এদিকে পশ্চিমবাংলার শস্যশ্যামল সমতল-ভূমি। এসব জায়গায় মানুষেরা দুরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই ভোগ করে থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ যে নতুন নতুন বিপদ এসে হানা দেয় তা বুঝে উঠতে পারা যায় না।

চাষিদের একটা গ্রামের কথা বলি। বেশ সুখেই চাষবাস করে দিন কাটছিল। কাছে-পিঠে মাঠ। সেখানে এক এক ঋতুতে এক এক রকম চাষ। কখনো ধান, কখনো গম—কোনো জমিতে আলু—এইরকম। কিন্তু একটা মাঠ পড়ে ছিল যেখানে কেউ চাষ করত না। সেখানে নাকি ফসল ফলে না। খাঁ-খাঁ মাঠ পড়ে আছে। সেখানে একটিমাত্র বিরাট বটগাছ ছাড়া আর কোনো গাছের চিহ্নমাত্র নেই। এ মাঠের কেন এই দশা কেউ বলতে পারে না, কেউ বলে, ভুতুড়ে মাঠ। কেউ বলে, ঐ বটগাছে থাকে ব্রহ্মদত্যি। তাঁরই ক্রোধে এই অবস্থা। কেউ বলে এখানে নাকি কোনোকালে ছিল এক অত্যাচারী জমিদার। এক সন্ন্যাসীর শাপে—সব শেষ হয়ে গেল ইত্যাদি।

যাই হোক এমনি নানা কিংবদন্তী নিয়ে এ গ্রামের মানুষরা মোটামুটি সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। একদিন ঘটল সামান্য একটা ঘটনা। সন্ধের মুখে খোঁয়াড়ে গিয়ে এক চাষি-বৌ দেখল একটা ছাগলছানা ফেরেনি। কী হল ছাগলছানার? রোজই তো সন্ধের আগেই সব মাঠ থেকে চরে ফেরে। শেয়াল এখানে নেই যে শেয়ালে খাবে! তাহলে?

তার কিছুদিন পরেই গভীর রাত্রে একটা বাচ্চা কুকুরের কান্না ভেসে এল। কিসে যেন কুকুর ছানাটাকে ধরে কোথায় টেনে নিয়ে গেল।

বটগাছটায় যে পাখিগুলো অনেক দিন থেকে আরামে বাসা বেঁধে থাকত—একদিন দেখা গেল সে পাখিগুলো আর নেই। কোথায় পালিয়ে গেছে! কেন এমন হচ্ছে? গ্রামের মাতব্বররা পরামর্শে বসল। না, কোনো কিছুই বুদ্ধিতে ধরা পড়ল না। শুধু তারা এইটুকু বুঝল—গ্রামের বুকের উপরে কোনো দুষ্টু দেবতার রুষ্ট দৃষ্টি পড়েছে। গ্রামের সর্বনাশ হবে।

একদিন গ্রামে হই-চই পড়ে গেল। পাশের গাঁয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে জনাকয়েক রাত্তিরবেলায় ফিরছিল ওই মাঠের পাশ দিয়ে। তারা স্বচক্ষে কী যেন দেখেছে। ক্রমশ এই দেখাটা ছড়িয়ে পড়ল। কেউ দুপুরে দেখল, কেউ বিকেলে দেখল, কেউ দেখল গভীর রাতে জ্যোৎস্নার আলোয়।

কী দেখল?

কেউ বলল—বিরাট চেহারা তাঁর। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। কেউ বলল, না, তিনি দুধের মতো সাদা। আবার কেউ বলল, তাঁর রঙ কেবলই বদলায়। এখন একরকম — পরক্ষণেই অন্যরকম।

তিনি বিরাট—কিন্তু বুকে ভর দিয়ে চলেন। কেউ বলল, তাঁর ঝড়ের গতি। তিনি যখন মাঠে ঘুরে বেড়ান তখন যেন ঝড় বয়। বলে, তাঁর গতি অতি মন্থর—অতি ধীর। যেন কালো সরু একটা নদী থমকে পড়ে আছে। কেউ বললে, কালো নদী কেন হবে? বরফের নদী! আর মাথার ওপর চোখ দুটো যেন জ্বলছে! আবার কারো মতে তাঁর জিভ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে।

এসব বড় অদ্ভুত বর্ণনা। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগে এ আবার কোন সৃষ্টিছাড়া আগন্তুক।

চাষিরা ও মাঠের ত্রিসীমানায় যায় না। সদাই আতঙ্ক। কত ওঝা কত গুণী কত বার এল গেল। কত ছককাটা, কত ঘরবন্দী, মাঠ-বন্দী, নজরবন্দী, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, যাগ-যজ্ঞ, কত বলিদান—সব বৃথা!

শহর থেকে এল দুজন মস্ত শিকারি বন্দুক-টন্দুক নিয়ে। পরের দিন সকালে মাঠের মধ্যে পাওয়া গেল তাদের মৃতদেহ শরীরের সমস্ত রক্ত কীরকম যেন কালচে হয়ে গেছে। যেন আগুনে কেউ সেঁকেছে এদের দেহগুলো।

দারুণ আতঙ্কে কাটে গ্রামবাসীদের দিন।

এমনি সময়ে ভিন-গাঁ থেকে ঘুরতে ঘুরতে তিনটে পাহাড় ডিঙিয়ে এল এক ফকির। বড়-বড় লালচে চোখ। কাঁধ পর্যন্ত কটা চুল। পরনে লুঙ্গি। গায়ে নানা ছিটের জোড়াতালি দেওয়া আলখাল্লা।

ফকির মাঠটা দেখে অবাক। এত বড় মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। একজন চাষি যাচ্ছিল ফকির তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "ও ভাই এ মাঠের এমন হাল কেন?"

চাষি বললে, "আজ্ঞে মাঠের রাজার কিরপা।"

"মাঠের রাজা। সে আবার কে?"

চাষি তখন সব বৃত্তান্ত বলল। শুনে ফকির হঠাৎ সেই মাঠের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে কান রেখে কী শুনল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল, তাই তো! এ জিনিস এখানে এল কোত্থেকে! "আচ্ছা, আমি তোমাদের মাঠের রাজাকে ধরে দিতে পারি।"

চাষি তখনই সেই সুসংবাদ দেবার জন্য মোড়লের বাড়ি ছুটল। একটু পরেই ভিড় জমে গেল ফকিরকে ঘিরে।

সবাই বললে, "ফকির সাহেব, আমাদের বাঁচান।"

ফকির বললে, "বেশ, বাঁচাব। তবে আমার অনেকগুলো বড়-বড় মাটির হাঁড়ি চাই।"

"মাটির হাঁড়ি! এ আর কি! পরের দিন সকালেই ফকিরের নির্দেশে তিন গোরুর গাড়ি বড়-বড় মাটির হাঁড়ি মাঠে এসে পড়ল। মাঠের চারদিকে ফকিরের কথামতো লোকে লাঠি, সড়কি, টাঙ্গি নিয়ে প্রস্তুত।

সময় হয়ে গেল। পাহাড়ের ওপর সূর্য গনগন করছে। কিন্তু ফকির কই? সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠছে। গোরুর গাড়ির গোরু-গুলো কী এক অজানা ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু ফকিরের পাত্তা নেই। তবে কি সবই ধাপ্পা?

এমন সময় দূরে ভেঁপুর শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল সাপুড়েরা যেরকম পেট-মোটা ভেঁপু বাজিয়ে সাপ খেলায় সেইরকম একটা ভেঁপু বাজাতে বাজাতে

ফকির হেলেদুলে আসছে। ফকির সাহেবকে দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে সেলাম করল। কিন্তু ফকির সাহেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সে সোজা বটগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। হাত-কুড়ি তফাতে যেখানে হাঁড়িগুলো গোরুর গাড়িতে রাখা ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দ্বিগুণ জোরে ভেঁপু বাজাতে লাগল। সাপুড়েদের বাঁশিতে যে সুর বাজে ঠিক সেই সুর।

দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—কুড়ি মিনিট —হঠাৎ একটা চাপা গর্জন...তারপরই বট-গাছের একটা গহ্বর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বিরাট একটা চকচকে মাথা। মাথার পর বেরিয়ে আসতে লাগল দেহ—ঠিক যেন একটা চোঙার মধ্যে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

এবার মাথাটা উঠল। বিরাট একটা ফণার আকার ধারণ করল। তারপর সেই ফণা ভেঁপুর শব্দে দুলে দুলে উঁচু হতে লাগল।

ফকির সাহেব দু পা পিছিয়ে এলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ফণা জোরে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিষাক্ত ফেনায় মাঠের সবুজ ঘাসগুলো কুঁকড়ে গেল।

ফণা আবার উঠল। এবার ফকির সাহেবের মাথা লক্ষ করে ফণা নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে একটা হাঁড়ি সামনে তুলে ধরল ফকির। ছোবল পড়ল হাঁড়ির ওপর। হাঁড়ি ফেটে চৌচির। ফের উদ্যত ছোবল—ফের একটা হাঁড়ি দিয়ে আত্মরক্ষা। এমনি করে ছোবলের পর ছোবল—হাঁড়ির পর হাঁড়ি। শেষে ছোবল মারতে মারতে মাঠের রাজার দাঁতের সব বিষ ঝরে পড়ল। যখন দু গাড়ি হাঁড়ি ভেঙে চূর্ণ তখন রাজা ক্লান্ত, অবসন্ন। আর তখনই ফকির সাহেবের ইঙ্গিতে গ্রামের লোকেরা লাঠি-সড়কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজার ওপর। ব্যস। তারপর সব শেষ—বিপদের শান্তি। সেই মাঠেই ফকিরের নির্দেশে কবর দেওয়া হল মাঠের রাজাকে।

এখন অবশ্য আর ছাগলছানা হারায় না। কুকুরের বাচ্চার কান্না শোনা যায় না। দিনের বেলায় লোক চলাচল করে।

কিন্তু রাত্রিবেলায়? থাক সে কথা। নানা লোকে নানা কথা বলে। সে-সব বিশ্বাস্য নয়।

ছবি : রতন সেন

ভেলুর কীর্তি

তপনকুমার প্রামাণিক

এ-পাড়ার ভেলুটা
সারাদিন ধরে,
ঘেউ ঘেউ চিৎকারে
পাড়া মাত করে।
সন্ধে হলেই সে যে
কোথা চলে যায়!
তখন নাগাল তার
খুঁজে পাওয়া দায়!
ও-পাড়ার লোক আসে
দিনের বেলায়,
ছুটে গিয়ে তাড়া করে
কামড়াতে চায়!
চুপিচুপি ঢোকে যবে
বেপাড়ার চোর,
তখন নেইকো ভেলু—
রাত ঘনঘোর!

ছবি : দেবাশিস দেব

সমাজের গল্প

কুন্তক

রাশিয়ার একজন বড় লেখক অল্প-বয়সী এক লেখককে বকে দিয়েছিলেন একবার। কেন জানিস?

নন্তু বলল : ছোটদের বকে দেওয়াটাই বড়দের অভ্যাস। সেইজন্যে। এ তো সহজ কথা।

না, ঠিক সেইজন্যে নয়। নবীন লেখকটি এক উপন্যাস লিখেছিলেন। তার যেখানেই দিনের বর্ণনা, সেখানেই ছিল ঝকঝকে সূর্য।

তাতে বকার কী হল?

প্রবীণ জিজ্ঞেস করলেন নবীনকে, তোমার শহরে কখনো তুষার দেখেছ বাপু? মেঘ? ঝড়বৃষ্টি? নবীন তো অবাক। দেখবে না কেন? অনেক দেখেছে। তাহলে তার কথা বলোনি কেন সে কখনোই? জিজ্ঞেস করলেন প্রবীণ। বলতে পারিস নন্তু, কেন বলেনি?

ভাল লাগেনি, তাই বলেনি।

ঠিক তা নয়। সে ঠিক করে নিয়েছিল, পাঠকদের কখনো দমিয়ে দেওয়া চলবে না। তাদের কেবল আশার কথাই বলতে হবে। তাই তুষারপাত হলেও তুষারের কথা বলা ঠিক হবে না, সূর্যের কথা বলতে হবে।

টুম্পি বলল : এই বলছ আশার কথা, এই বলছ সূর্যের কথা।

ওইটেই তো আসল কথা। দুটো আলাদা ব্যাপার রইল না আর। সূর্যকে ওই নবীনটি আর সূর্য বলে দেখছে না, দেখছে কেবল আশার আনন্দের জীবনের মূর্তি হিসেবে।

প্রতীক হয়ে গেছে ওটা।

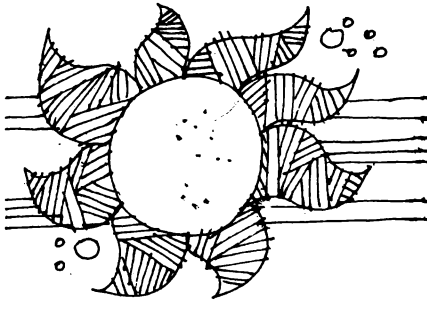

জিজ্ঞেস করল টুম্পি : যারা পড়বে তারা বুঝবে সেটা?

সব সময়ে যে মাথা দিয়ে বুঝবে তা নাও হতে পারে। তবে পড়তে-পড়তে মনের ওপর তো কাজ চলতে থাকে একটা। তার একটা ফল হয় নিশ্চয়।

ছাই হয়। সূর্য বললে সূর্যকেই ভাবব না?

তা তো নিশ্চয় ভাববি। কিন্তু সেই-সঙ্গেই আবার একটা অন্য ইঙ্গিতও পেয়ে যাবি। সন্ধ্যা বললেই বিপদের কথা অবসানের কথা, সকাল বললেই সূচনার কথা, আনন্দের কথা—এসব এখন জড়িয়ে গেছে অনেকের মনে।

নন্তু বলল : বুঝেছি এবার। লেখকদের তবে বকাই দরকার। সূর্য বললেই আশা, মেঘ বললেই নিরাশা, সকাল বললেই ভাল, সন্ধ্যা বললেই মন্দ—এসব তো তবে সবাই জানে। সেটা আর নতুন করে লিখবার দরকার কী।

কেউ যা জানে না, সেটাই বুঝি শুধু লিখতে হবে? ওটা কোনো কথা নয়। তবে, সবার জানা দিয়ে লেখা হয় যেমন, নতুনভাবে জানানোর জন্যেও নিশ্চয় তেমনি লেখা যায়। সুকান্তের কবিতায় পড়েছিস না একটা মোরগের কাহিনী? মোরগটা খাবারের খোঁজে ঢুকতে চাইছিল এক প্রাসাদে, ঢুকলও শেষে, 'অবশ্য খাবার খেতে নয়/খাবার হিসেবে।' মোরগেরই গল্প এটা, কিন্তু কেবলই তো মোরগের নয়। হয়ে এল যেন সব গরিব-মানুষেরই কথা।

এর উলটোটা বুঝি চিল?—জিজ্ঞেস করে নন্তু।

উলটো কেন রে দাদা?

নন্তু বলল : একটা চিলের কথা আছে না সুকান্তের কবিতায়? ছোঁ মেরে যে খেয়ে নিত সব? সে আজ মরে পড়ে আছে ফুটপাতে।

কী হল তাতে?

হল না কিছু। অনেক উঁচু থেকে অত্যাচার করছে যারা, তাদেরই কথা বলা হল ইঙ্গিতে। মোরগের গল্পও নয়, চিলের গল্পও নয়। এসব হল সমাজের গল্প। তাই তো কাকু? (ক্রমশ)

নতুন বন্ধু

প্রসাদ

সেদিন চম্বলদের ক্লাসে একজন নতুন ছেলে ভর্তি হল। অঙ্কের ক্লাস হচ্ছিল।

Mathematics teacher: Make room for our new friend, will you, boys? Anil, will you move over and let our friend sit by your side? Thank you.

The new boy thanked Anil and sat on his side.

Mathematics teacher: Good. Now let me introduce our new friend to the class. He is Mr. Jayanta Goswami, just arrived in the city from Agartala. I'm sure Jayanta will soon have many friends in the class. Now let's get on with the work, shall we?

নতুন ছেলে ক্লাসে এলে তাকে নিয়ে একটু মজা করবার লোভ হয় অনেকেরই। জয়ন্তও যে একেবারে রেহাই পেয়ে যাবে তা মনে হয় না। তবে এ-ইস্কুলে তেমন বাড়াবাড়ি কিছু করবার রেওয়াজ নেই, আর জয়ন্তকে দেখে সহজে বোকা বলবার ছেলে বলেও মনে হচ্ছে না। যাই হোক, সে-সব কথা আরেক দিন হবে। আজ একটু কাজের কথা হোক। অর্থাৎ :

Let us get on with the work, shall we?

এই কথাটাই অন্যরকম ভাবেও বলা যায় :

May we get on with the work?

Do you mind if we get on with the work?

আসলে এগুলো প্রশ্ন হলেও, ঠিক প্রশ্ন নয়, বরং বলা যায় অনুরোধ। যেমন ধরো, পাশের ছেলেটিকে তুমি বলতে পারো :

Lend me your pencil, will you?

Would you mind lending me your pencil?

May I borrow your pencil for a minute?

কিংবা, বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার মার সঙ্গে কেউ কথা বলছেন, তখন মা তাঁকে বলতে পারেন :

Won't you come in?

কিংবা বাড়িতেই কেউ বেড়াতে এসেছেন, তখন এ রকম কথা হতে পারে :

Won't you stay a little longer?

Won't you have a little more tea?

অবশ্য অনুরোধও সব এক রকমের নয়। যার কাছে সহজেই পেনসিল ধার চাওয়া যায়, তাকে :

Lend me your pencil, will you?

কিন্তু যে তোমার বন্ধু কিংবা আপন জন নয়, তাকে আরেকটু সসংকোচে বলতে হয় :

Would you lend me your pencil for a minute?

কিংবা, আরো ভদ্রতার প্রয়োজন হলে :

Would you mind lending me your pencil?

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

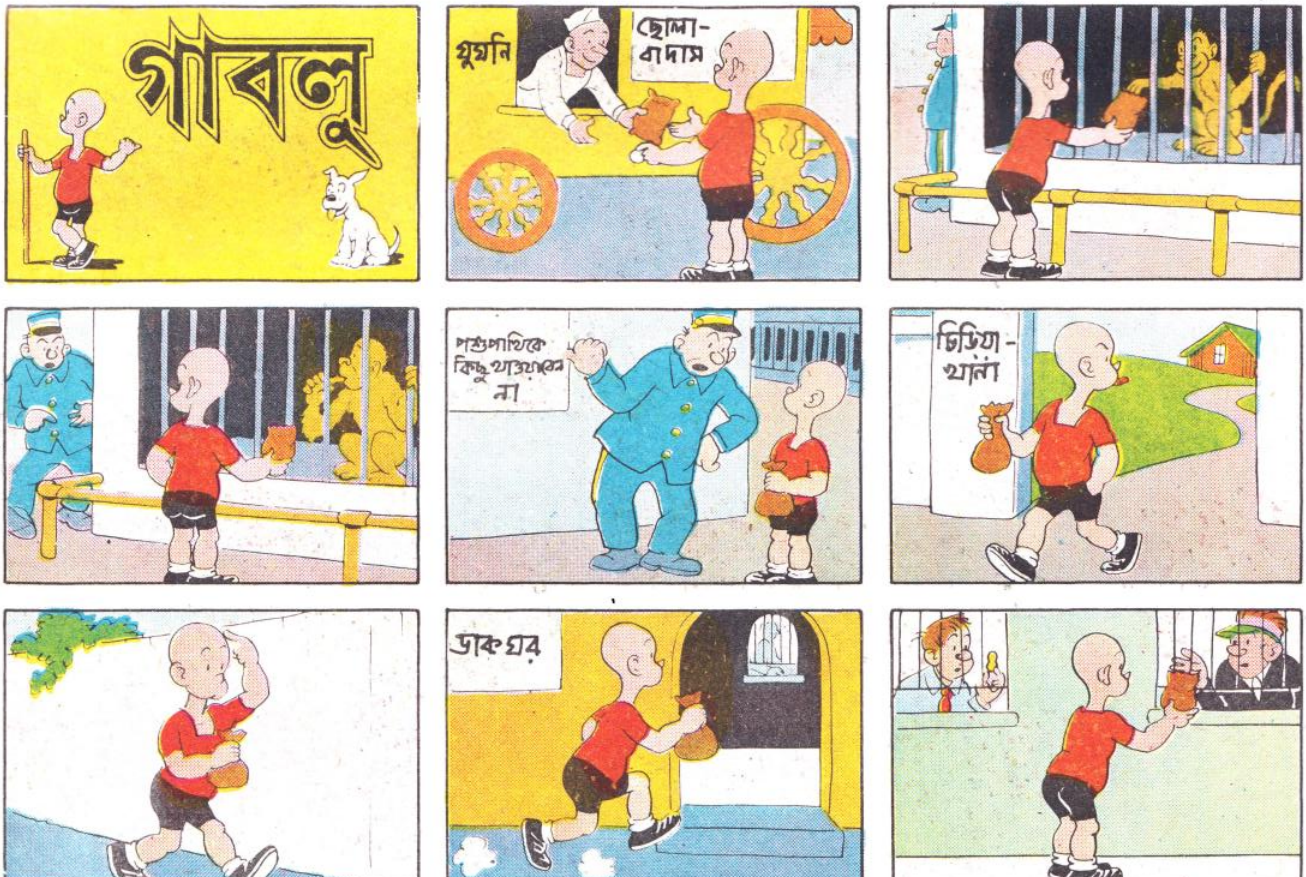
গাবলু
ঘুঘনি
ছোলা-বাদাম
পশুপাখিকে কিছু খাওয়াবেন না
চিড়িয়া-খানা
ডাকঘর

হরিনাভি ডি. ভি. এ. এস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

প্রবীর ঘোষ

১৮৬৬ সালে গোড়াপত্তনের সময় নাম ছিল 'হরিনাভি স্কুল'। ১৮৬৭ সালে নাম হল হরিনাভি এ. এস. স্কুল। ১৯৬৬-তে স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসব পালনের কিছু দিন আগে এক জনসভায় নামকরণ করা হয় 'হরিনাভি দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ ইংরাজী-সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয়'। শিবনাথ শস্ত্রীর

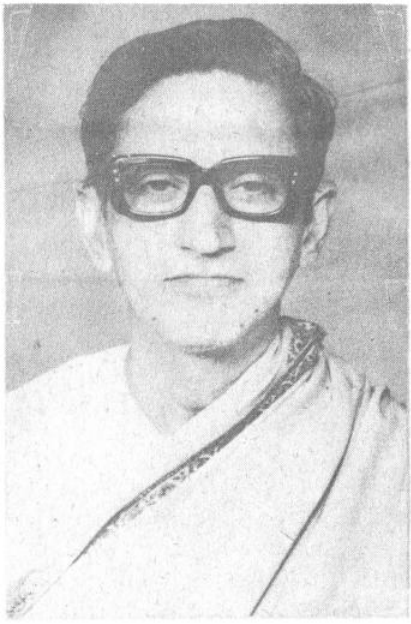

মামা সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং তৎকালীন বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক সুপণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুর মহকুমার হরিনাভি মিউনিসিপ্যালিটির গায়েই সদর রাস্তার ধারে অবস্থিত মেটে লাল রঙের এই স্কুলটি বোধহয় চব্বিশ পরগনা জেলার সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী উচ্চ বিদ্যালয়। শুধু তাই নয়, এই স্কুলে অবিভক্ত বাংলার তথা ভারতের অনেক বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা পড়েছেন, পড়িয়েছেন এবং স্কুলটি পরিচালনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক-সংগঠক হিসাবে উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিক্ষক হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাবা প্রকাশচন্দ্র রায়, লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র রূপে শ্রীনাথ বিদ্যানিধি, নেতাজীর পিতা জানকীনাথ বসু, বিপ্লবী এম এন রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রমুখ। ১৭ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলটি শুরু হলেও, প্রাইমারি সেকশন-সহ এই উচ্চতর বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এখন প্রায় ১৩৫০।

হরিনাভি স্কুলের ছাত্র এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ সাল থেকে এই স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানালেন যে, তাঁর স্কুল থেকে একাধিকবার স্ট্যান্ড করেছে। বহুবার জাতীয় মেধা-বৃত্তি পেয়েছে। পাশের হার বরাবরই ভাল। গতবারে ছিল ৯০ পারসেন্ট। আনন্দমোহনবাবু প্রায় সব বিষয় পড়াতে পারলেও মূলত বাংলা ও ফিজিক্যাল-সায়েন্স পড়ান।

জিজ্ঞাসা করি, বাংলাতে কীভাবে বেশি নম্বর তোলা যায়? প্রধান শিক্ষকের উত্তর, 'টেক্সটটা ভালভাবে পড়া প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে থেকেই খুব ভাল লিখতে পারবে আমি মনে করি না। তাই তাদের অন্তত কিছু প্রশ্নের ভাল উত্তর তৈরি করে দেওয়া দরকার। ভাল নম্বর তুলতে হলে রেফারেন্স বই এবং পত্র-পত্রিকা তো পড়তেই হয়। পড়ার সঙ্গে লেখার নিয়মিত অভ্যাস রাখা অবশ্য প্রয়োজন।' ফিজিক্যাল-সায়েন্স প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা জানিয়ে তিনি বললেন, 'একটা বই ভালভাবে না পড়ে পাঁচটা বই পড়ার দরকার নেই। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে

লেখাতেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। লেখার পর মাস্টারমশাইকে দেখালে ভুল-গুলো শুধরে যায়। তিনি বাড়তি পয়েন্ট দিতে বা কী বাদ গেল বলে দিতে পারবেন। তাছাড়া লিখলে বিষয়টা মনেও থাকে বেশি।'

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানালেন, অন্য সাবজেকটে একটি বই ভালভাবে পড়লেও বেশি নম্বর তোলা যায় বটে, কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানে বেশি নম্বর তুলতে হলে একাধিক বই পড়তেই হবে। অঙ্কের জন্য সবার আগে চাই রেগুলার প্র্যাকটিস। ফর্মুলাটা মুখস্থ থাকা দরকার। আর যে-চ্যাপটারটি করছে, সেটাই অন্য বই থেকে এক্সারসাইজ দেখে করুক। নিজে একাধিকবার চেষ্টা করে না পারলে, মাস্টারমশাইয়ের সাহায্য চাইবে। তার আগে নয়। নিজে করতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভালভাবে মনে থাকে।'

ইংরাজি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : 'আগের মতো বেশি ক্লাস এখন সম্ভব নয় বলে (বিভিন্ন পরীক্ষার সীট পড়ার জন্য) সিলেবাসও শেষ হয় না। এদিকে পরপর উপরের ক্লাসে উঠে যাচ্ছে। ফলে যে রচনাগুলি পড়ানো হচ্ছে না, তার সংখ্যা তো ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। তাই যতই টেক্সট পড়ুক এই ব্যাপারটার সমাধান না হলে বেশি নম্বর উঠবে কি করে? টেক্সটটা বুঝে পড়তে হয়। একটি পদ্য বা গদ্য রচনা থেকে কত রকমের প্রশ্ন হতে পারে, গ্রামার হতে পারে, তা জানতে হবে। এ-বিষয়ে অভিভাবক এবং শিক্ষকের যথাযথ সহায়তা বিশেষ দরকার।'

টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট বয়

দক্ষিণ কলকাতার একেবারে শেষ প্রান্তে গড়িয়ায় জয়সোনাদের বাড়ি। চোদ্দ বছর বয়সি জয়সোনা ঘোষ ক্লাস ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছে এবং বরাবরই ফার্স্ট হয়ে আসছে। টেস্ট পরীক্ষায় শতকরা ৭৭ নম্বর পেয়ে যথারীতি সে প্রথম হয়েছে।

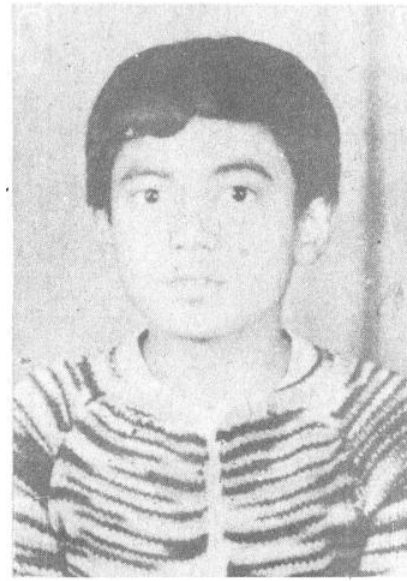

জয়সোনা এখন সাধারণত সকালে তিন ঘণ্টা এবং দুপুরে দেড় ঘন্টা পড়ে। গৃহ শিক্ষক একজন আছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছেও সায়েন্স সাবজেকট পড়তে যায়। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। মা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। ভাইবোনের মধ্যে ও সবার ছোট।

ফিজিক্যাল সায়েন্স জয়সোনার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়—টেস্টে ৮৯ পেয়েছে। ইতিহাস ওকে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয়। সব প্রশ্নের ঠিকঠিক উত্তর লেখার সময় পায় না বাংলা প্রথম পত্রে। স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে পড়াশুনার ব্যাপারে খুব সাহায্য পায়। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা পাওয়ার পর, মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে জেনে নিত, কোথায় ভুল হয়েছে এবং বেশি নম্বর তুলতে হলে আরো ভাল কীভাবে লিখতে হবে।

জয়সোনা ফুটবল খেলতে ভালবাসে। ক্রিকেটও খেলে। শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সত্যজিৎ রায় ও সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের লেখার ভক্ত জয়সোনার ইচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার হবে।

বাঘা

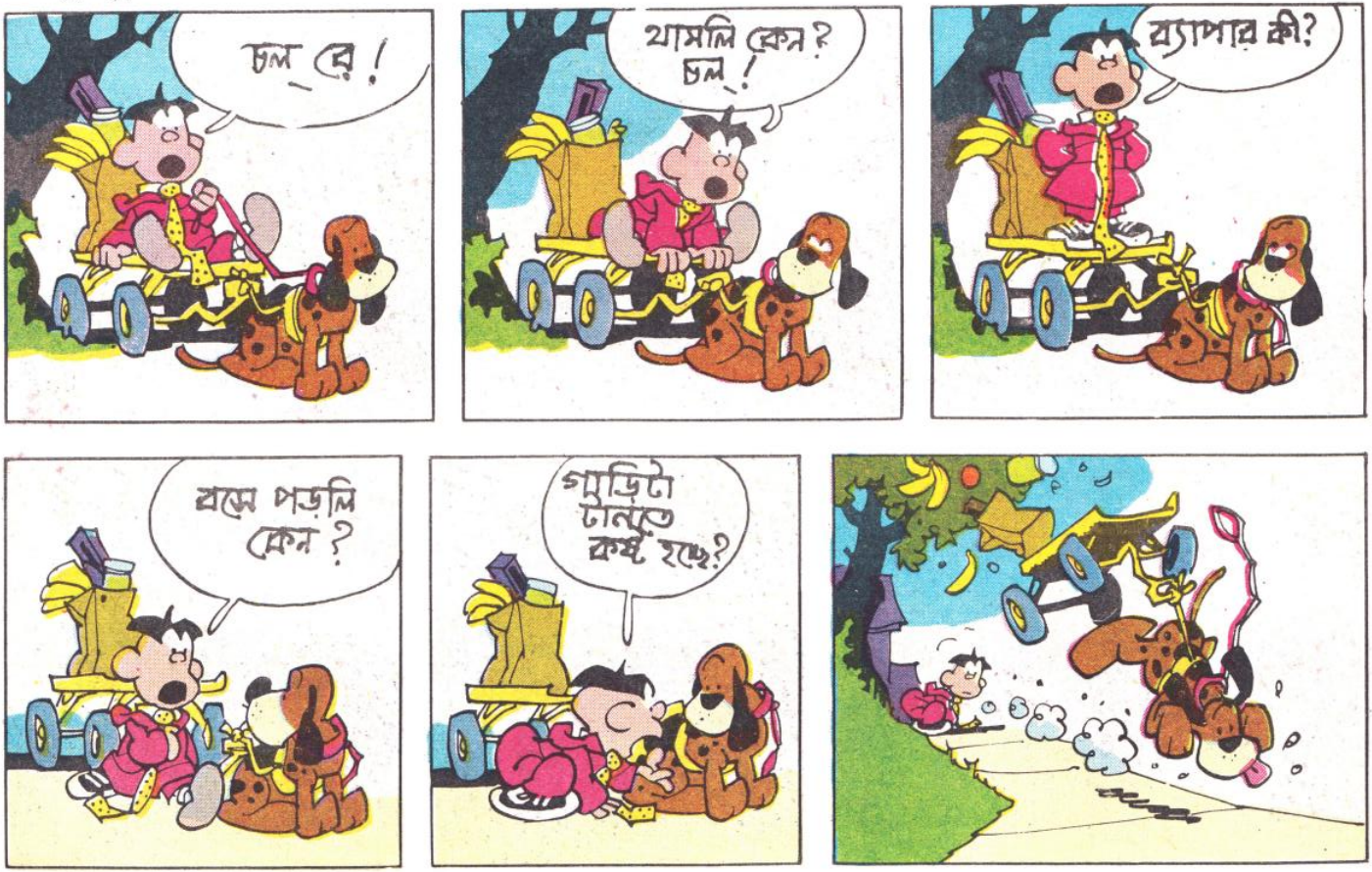

গাবলু
গোয়েন্দার বাক্স
খুট!

গল্পে ধাঁধা

হিমাদ্রি লাহিড়ী

গোয়েন্দা দে পুলিস অফিসার সিদ্ধেশ্বর বসুকে বললেন, "বলেন কী? একেবারে হাজতে খুন!"

সিদ্ধেশ্বর বসু বললেন, "আর বলেন কেন। কাল রাত্রে দুজন দাগী এবং পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী গুণ্ডাকে একই ঘরে লক-আপে বন্দী করে রাখা হয়। ওদের দুজনের কেউই এই থানায় অপরিচিত নয়। সন্ধে তখন সাতটা। আটটা নাগাদ আমাদের চৌকিদার ভজু তাদের শালপাতায় রুটি, ডাল, তরকারি এবং নরম পলিথিনের তৈরি গ্লাসে জল দিয়ে আসে। তালা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে পাহারাদার দুজন। ভজু বেরিয়ে এলে দরজায় দুটো তালা দেওয়া হয়। তারপর আবার তালা দেওয়া হয় প্রধান দরজায়।"

"প্রধান দরজা?" গোয়েন্দা দে প্রশ্ন করলেন, "সেটা কী রকম?"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, "আমাদের থানায় হাজতবাসের জন্য তিনটে ঘর আছে। তাদের লোহার শিকের দরজা তিনটেতেই আলাদা করে তালা দেওয়া যায়। আবার ঐ তিনটে ঘরে যাওয়ার পথে একটা লোহার দরজা আছে, সেটাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখা হয়। গতকাল মধ্য কলকাতায় মাতলামি আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপরাধে দুজনকে আনা হয়, আর তাদের আটকে রাখা হয়। আজ সকালে হাজতঘরের দরজায় প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে প্রথম দরজা খুলে দেখা যায় বিশু গুণ্ডা বলছে, হিরুকে কে যেন রাত্রে মেরে ফেলেছে। দরজা খুলে দেখা গেল হিরু সত্যিই মরে পড়ে আছে। তার মাথার চোট দেখে মনে হয় কোনো ভারী জিনিসের আঘাতে তাকে মারা হয়েছে। রক্তের দাগ এবং মৃতদেহের অবস্থা দেখে মনে হয় রাত দশটা কি এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়েছে। বিশু বলছে, সে সারারাত ঘুমিয়ে ছিল, কিচ্ছু টের পায়নি। ও বলছে, নিশ্চয় কেউ তার খাদ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। নইলে ও টের পেল না কেন?"

গোয়েন্দা দে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুমের ওষুধ মেশাতে পারে ভজু। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, "তবে সে ঝগড়া অস্বীকার করছে আর কান্নাকাটি করছে। তা ছাড়া, আশ্চর্য ব্যাপার যে, যে জিনিস দিয়ে হিরুকে খুন করা হয়েছে সেই অস্ত্র হাজতের কোথাও পাওয়া যায়নি।"

"অথচ ডবল তালা দেওয়া ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, "আর এটাও ঠিক, ভজু খাবার দিয়ে আসার পর কেউ হাজতঘরে ঢোকেনি।"

গোয়েন্দা দে বললেন, "জানালা দিয়ে কেউ অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে—কাজ হয়ে গেলে সে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারে।"

"আজ্ঞে, হাজতঘরে কোনো জানালাই নেই। পাশে বাথরুম, তাতে একটা পলিথিনে-তৈরি মগ ছাড়া কিছু নেই—উপরে ছাতের কাছে আট ইঞ্চি চওড়া আর দশ ইঞ্চি লম্বা একটা ফুটো আছে, কিন্তু তাতেও লোহার শিক লাগানো। বাইরে থেকে একটু আলো, একটু হাওয়া আসে। ওখান দিয়ে কোনো অস্ত্র আসা সম্ভব নয়।"

"খুবই রহস্যজনক ব্যাপার!" গোয়েন্দা দে বললেন, "তবে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। ভজু দিয়েছে অস্ত্র, বিশুই হত্যাকারী।"

ভজু কী অস্ত্র দিয়েছিল? হিরুকে বিশু হত্যা করেছিল কীভাবে এবং কেন? অস্ত্র কোথায় গেল?

উত্তর : থানায় হাজতে পুরবার সময় বিশু বলেছিল ভজুকে, তাকে গোপনে কেজি দুয়েক বরফের একটি চাঙড় দিতে। ঐ থানায় বিশু অপরিচিত নয়। ভজু বরফের কথায় কিছু মনে করেনি। সে হয়তো কয়েকটা টাকার লোভে গামছা করে দু কেজি বরফ চানের ঘরে রেখে আসে। পরে হিরু ঘুমুলে ঐ বরফের চাঙড় দিয়েই বিশু তাকে হত্যা করে। গরমকাল, বরফ গলে জল হয়ে যায়। ভজুকে অবশ্য খুনের সঙ্গে জড়ানো যায়নি। হিরু ছিল বিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী—হত্যার এটাই কারণ।

বেশী সাশ্রয় ও বেশী সাদা চান
তো সাবানের কথা ভুলে যান, আনান

সুপার৭৭৭ ডিটারজেন্ট বার

•সাবানের চেয়ে ১½ গুণ বেশী শক্তিশালী, বেশী সাশ্রয়ী!
•অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার যুক্ত!!

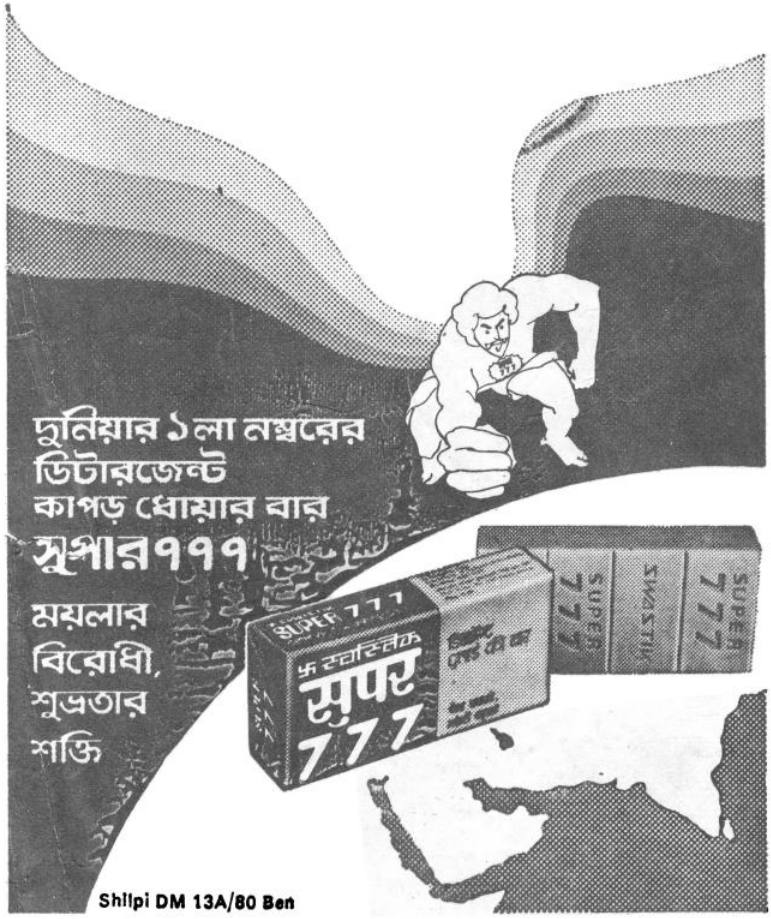

everest/80/PP/309-bn.